দেওয়ান

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

MR. HASTINGS'S Government was one whole system of oppresion of robbery of individuals, of destruction of the public, and of supersession of the whole system of the English Government, in order to vest in the worst of the natives all the powers that could possibly exist in any government, in order to defeat the ends which all governments ought in common to have in view—*E. Burke.*

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

[চতুর্থ সংস্করণ।]

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৪।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"

শ্রীপঞ্চানন বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আমার লিখিত মহারাজ নন্দকুমার তিন চারি মাসের মধ্যে প্রায় সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিবার বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছে।

১৭৭৩ সালের রঙ্গপুরের বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়াই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ নামে এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের উল্লিখিত প্রায় সমুদয় ঘটনাই সত্য।

মহারাজ নন্দকুমার পাঠ করিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, ইহার কোন অংশ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং কোন অংশ কাল্পনিক, তাহা সাধারণ পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের যে যে অংশ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহার প্রমাণ পুস্তকের ইংরাজি পরিশিষ্টে (English appendix) উল্লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের উল্লিখিত ঘটনা সমুদায়ের প্রমাণও ইংরাজি পরিশিষ্টে (English appendix) উল্লিখিত হইল।

৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৭মে ১৮৮৬ } শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ অনেক দিন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পুনর্মুদ্রণের জন্য গ্রন্থকারকে অনুরোধ করায় তিনি পুস্তক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এজন্য আমি নিজ ব্যয়ে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গ্রন্থকার এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব (Copy-rihgt) আমাকে দান করিয়াছেন। পুস্তকখানিকে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদিগের সুখপাঠ্য করিবার জন্য গ্রন্থকার বর্ত্তমান সংস্করণে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বের দোষ সকল সংশোধন এবং কোনও কোনও স্থান পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

দেওয়ান

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

১৭৭২ সালের পাঁচ সনা বন্দোবস্তের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেশের জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের এখন কণ্ঠাগতপ্রাণ। তাঁহারা সকলেই চিন্তা করিতেছেন, না জানি এবার আবার কি নূতন নিয়ম জারি হয়। হয় তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবার সকল জমিদারকেই উৎখাত করিয়া, নূতন লোকের সহিত জমির বন্দোবস্ত করিবেন।

দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা ওয়ারেন হেষ্টিংস। ভূমিতে জমিদারদিগের কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে বলিয়া, তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে না পারিলে, কাহারও আপন জমিদারী ভোগ করিবার সাধ্য নাই।

ওয়ারেন হেষ্টিংস অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী লোক। তিনি দেশের আচার ব্যবহার আইন কানুন মতে চলেন না; কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের হুকুমও বড় মান্য করেন না; আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন। তবে দশ বিশ হাজার টাকা উৎকোচ দিতে পারিলে, তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন। সুতরাং অধিকাংশ মেম্বরের মতানুসারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু বিপক্ষদলের মধ্যে কর্ণেল মন্‌সনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন কেবল ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এবং জেনেরল ক্লেবারিং তাঁহার বিপক্ষ। এদিকে রিচার্ড বারওয়েল

ছায়ার ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন; সর্ব্বদাই তাঁহার মত সমর্থন করেন। কৌন্সিলে কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে, এখন এপক্ষেও দুই জন, ওপক্ষেও দুই জন। সুতরাং সভাপতি গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংস যে পক্ষে থাকেন, সেই পক্ষের মতানুসারেই কার্য্য হয়। কৌন্সিলের মধ্যে হেষ্টিংসের অপ্রতিহত প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই সময়ে লর্ড নর্থ ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী ছিলেন। হেষ্টিংসের অসদাচরণ, কুক্রিয়া এবং নৃশংস ব্যবহার লর্ড নর্থের কর্ণগোচর হইল। নিরাশ্রয়া রোহিলা রমণীদিগের ক্রন্দনধ্বনি এবং আর্ত্তনাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। লর্ড নর্থ কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ সুসভ্য ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ নিরপরাধা রোহিলা রমণীদিগের নাসিকা কর্ণ ছিন্ন করিয়া, তাঁহাদিগের স্বর্ণাভরণ অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া, বিবস্ত্রাবস্থায় বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুজা উদ্দৌলার তাঁবুতে ধরিয়া আনিয়াছে। অর্থগৃধ্নু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে দেশ-শাসনের ক্ষমতা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত বড় দিনের (Christmas) পূর্ব্বেই পার্লেমেণ্ট সভা আহ্বান করিতে হইবে।"

হেষ্টিংসের ইংলণ্ডস্থিত এজেণ্ট (আমমোক্তার) ম্যাক্লিন্ সাহেব দেখিলেন যে, মহাবিপদ্ উপস্থিত। হেষ্টিংস পূর্ব্বেই তাঁহার এজেণ্ট ম্যাক্লিন্ সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "বড় আঁটাআঁটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমার পক্ষ হইতে পদত্যাগের এস্তফা-পত্র দাখিল করিবে।"

ম্যাক্লিন্ সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষ হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট তাঁহার পদত্যাগের এস্তফা-পত্র দাখিল করিলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হেষ্টিংসের অসদাচরণ নিবন্ধন হয় তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যশাসনের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের এস্তফা মঞ্জুর করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে হুইলার সাহেবকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদে মনোনীত করিলেন; এবং হুইলার সাহেবের ভারতে পৌঁছান পর্য্যন্ত জেনেরল ক্লেবারিংকে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে লিখিলেন।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পত্র ভারতবর্ষে পৌঁছিল। হেষ্টিংস অনন্যোপায়

হইয়া পড়িলেন। এখন নূতন বন্দোবস্তের সময়। এ সময়ে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ কর্ণেল মন্সনের মৃত্যুর পর, এখন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। এ সময় কি পদত্যাগ করা যাইতে পারে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হেষ্টিংস বলিলেন, "আমি আমার আমমোক্তার ম্যাক্লিন্ সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করি নাই। আমি গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিত্যাগ করিব না।"

জেনেরল ক্লেবারিং হেষ্টিংসের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের নিকট মালখানার এবং দুর্গের চাবী চাহিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে চাবী প্রদান করিলেন না। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। জেনেরল ক্লেবারিং আইনানুসারে আপনাকে গবর্ণর জেনেরলের পদাভিষিক্ত মনে করিয়া, ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্‌কে লইয়া, কৌন্সিলগৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস বারওয়েল সাহেবকে লইয়া অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং সমুদয় লোককে জেনেরল ক্লেবারিংএর হুকুম অমান্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জেনেরল ক্লেবারিং গবর্ণর জেনেরল হইলে উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা থাকিবে না; দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমুদয় স্বার্থপর ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং অনেকানেক দেশীয় কুলাঙ্গার জেনেরল ক্লেবারিংএর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হেষ্টিংসের প্রস্তাবানুসারে জেনেরল ক্লেবারিং এবং হেষ্টিংস উভয়েই তাঁহাদের মধ্যে এই বিবাদ মীমাংসার ভার সুপ্রিমকোর্টের জজদিগের প্রতি অর্পণ করিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পি। তিনি হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু। তাঁহার বিচারে হেষ্টিংসেরই জয়-লাভ হইল। তিনি বলিলেন "হেষ্টিংসের আমমোক্তারের প্রদত্ত পদত্যাগপত্র কোর্ট অব্ ডিরেক্টর গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। সুতরাং হেষ্টিংস আইনানুসারে পদচ্যুত হয়েন নাই।"

এইরূপে হেষ্টিংসের পদ রহিল, এবং তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে জেনেরল ক্লেবারিং পরলোক গমন করিলেন।

সুতরাং হেষ্টিংসের একাধিপত্য আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এদিকে ভূমিসংক্রান্ত নূতন বন্দোবস্তের সময়ও সমুপস্থিত হইল।

দেশের প্রধান প্রধান জমিদার ও তালুকদার আপন আপন নায়েব, গোমস্তা এবং আমমোক্তারদিগকে দরবার করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা-রাজস্বসমিতির আমলাদিগের বাড়ী প্রত্যহই লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। খাল্‌সা ডিপার্টমেণ্টের রায় রাঁইয়ার বাড়ীতে অহোরাত্র লোক যাতায়াত করিতে লাগিল।

কিন্তু জমিদারদিগের প্রেরিত লোকেরা অত্যল্প কাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, সমুদয় বন্দোবস্তের ভার হেষ্টিংসের হাতে। সুতরাং হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্রদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না। হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র কে?

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, এক দিন প্রাতে, এক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বসিয়া নানাবিধ বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। নজরের টাকা হস্তে করিয়া শত শত জমিদার তালুকদার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অনেকানেক জমিদারের গোমস্তা আপন আপন প্রভুর পত্র ও নজরসহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সাক্ষাতে কেহ বসিতেও সাহস করেন না। এই সকল লোকের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরিত একজন ব্রাহ্মণ একখানি পত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া পত্রখানি এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের শিরোভাগে লিখিত রহিয়াছে—

"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য;
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।"

এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নাম দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। পাঠকগণের জ্ঞাত করণার্থে আমরা এই স্থানে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

১৭৬৯ সালের পূর্ব্বে গঙ্গাগোবিন্দ সময় সময় স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধা-গোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কাননগুর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতির পর রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিলে, গঙ্গা-গোবিন্দ কার্য্যলাভের প্রত্যাশায় কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস সাহেব তখন বাঙ্গালাদেশের গবর্ণর। তাঁহার সময় গঙ্গা-গোবিন্দের ন্যায় সুচতুর এবং কার্য্যদক্ষ লোকের অতি সহজেই উচ্চপদ লাভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার, প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহারে গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের কনিষ্ঠ-সহোদর-সদৃশ ছিলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে খালসা ডিপার্ট-মেণ্টের রায় রাঁইয়া রাজা রাজবল্লভের অধীনে ডিপুটী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে ক্রমে রাজস্ববিভাগের সমুদয় কর্ম্মের ভার ন্যস্ত হইল। তিনি এতদ্ভিন্ন হেষ্টিংসের গৃহের দেওয়ান অথবা ঘরের সরকারের কার্য্যও করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে হেষ্টিংস তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অবশেষে ১৭৭৭ সালে তাঁহাকে কলিকাতাস্থ রাজস্ব-কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই বিপদ্ ও দুর্ঘটনা-পরিপূর্ণ সংসারে সময় সময় সকলকেই কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। হেষ্টিংসের বিপক্ষদল ১৭৭৫ সালের মে মাসে গঙ্গা-গোবিন্দকে উৎকোচ-গ্রহণ-অপরাধে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেব শত চেষ্টা করিয়াও গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ানের পদে বহাল রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু ১৭৭৬ সালে কর্ণেল মন্সনের মৃত্যু হইলে পর হেষ্টিংসের বিপক্ষদলের প্রভুত্ব একেবারে লোপ হইল। তখন হেষ্টিংস এবং বারওয়েল পুনর্ব্বার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৭৭৬ সালের ৮ই নবেম্বর গঙ্গাগোবিন্দ পুনর্ব্বার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং রাজস্ব আদায় বিভাগে আবার অপ্রতিহত ক্ষমতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। দেশের জমিদার তালুকদারগণ সর্ব্বদা তাঁহার সমীপে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন। অন্য

শত শত জমিদার, তালুকদার, জমিদারের নায়েব, গোমস্তা এবং আম-মোক্তার নজর হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

উপস্থিত জমিদারগণ ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, প্রায় বিশ পঁচিশজন পারিষদে পরিবেষ্টিত, মূল্যবান্ সুচারু পরিচ্ছদে সুসজ্জিত একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, সাদর সম্ভাষণে, তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের কথোপকথন আরম্ভ হইলে পর, অন্যান্য লোক ক্রমে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

অনেক কথাবার্ত্তার পর এই নবাগত কৃষ্ণকায় পুরুষ বলিলেন—"মহাশয়, আপনার দ্বারা যে আমার অনিষ্ট হইবে, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই। আপনি আমার একমাত্র বল, ভরসা।"

"আমার দ্বারা আপনার অনিষ্ট হইয়াছে! সে কি?"

"পদচ্যুত হইলাম, এও কি অনিষ্ট নহে?"

(ঈষৎ হাস্য করিয়া) "পদচ্যুতির পর আবার তো মকরর হইয়াছেন।"

"আবার মকরর হইয়াছি বটে; কিন্তু দাগীলোক হইয়া রহিয়াছি। নামের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে।"

"মহাশয়, দাগী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মতে সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লওয়া যায়। সেই দাগ ছিল বলিয়া, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব-সমিতির দেওয়ান হইয়াছেন।"

"আপনি বলেন দাগ থাকা ভাল। কিন্তু পূর্ব্বে একবার বরখাস্ত হইয়া-ছিলাম বলিয়াই তো রাজস্বসমিতি আমাকে আবার বরখাস্ত করিতে চাহে।"

"প্রদেশীয় রাজস্ব কমিটী (Provincial council) সত্বরই এবলিশ্ হইবে। আপনার সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই।"

"কমিটী এবলিশ্ হইলে, তাহাতেই বা আমার কি উপকার হইবে?"

"নূতন যে বন্দোবস্ত হইবে, তাহাতে আপনার অবশ্যই একটা না একটা সুবিধা হইবে।"

"আমার যে কোনরূপ সুবিধা হইবে, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

"আপনি এখন চিহ্নিত লোক। ওয়ারেন হেষ্টিংস নিশ্চিতই বুঝিয়াছেন

যে, আপনি অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী। আপনাকে তিনি কখনও ছাড়িবেন না।"

"আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থ আমি বুঝি না। গবর্ণর জেনেরল যদি আমাকে কার্য্যদক্ষ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শন-কালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন? আমি তো প্রাণপণে সরকারী কার্য্য সাধন করিয়াছি। ১৭৭০ সনের ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ও রাজস্ব আদায় করিতে কোন ত্রুটি করি নাই।"

"রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক যে পাওয়া যায় না, তাহা গবর্ণর জেনেরল বিলক্ষণ জানেন।"

"তাহা জানেন, তবে বরখাস্ত করিলেন কেন?"

"তিনি কি আর ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধে—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুরোধে—আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝি না। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধ কি—বুঝাইয়া বলুন দেখি।"

"পূর্ণিয়ার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কত শত জমিদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত আপনি মালের কাছারিতে আনিয়া বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার করা কিংবা তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা, বিলাতের লোকেরা বড় অন্যায় বলিয়া মনে করেন। এই সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পর, হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে বরখাস্ত না করিলে, তাঁহার নিজের উপর দোষ পড়িত; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনিও তাঁহার একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। আপনার নাম তিনি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"

"সে বৎসর জমিদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে ধরিয়া না আনিলে এক পয়সাও আদায় হইত না, তখন তো আপনাদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল না। মহম্মদ রেজাখাঁ নায়েব সুবাদার ছিলেন। তিনি বারংবার আমার নিকট হুকুম পাঠাইতে লাগিলেন—"যেরূপে পার পূর্ণিয়ার সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে হইবে;"—এদিকে ঘোর দুর্ভিক্ষ

উপস্থিত। জমিদার তালুকদারগণ, প্রজার নিকট হইতে এক পয়সাও কর আদায় করিতে পারে নাই। তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত টাকা হইতে রাজস্ব দিতে হইল। কিন্তু ঘরের টাকা কি লোকে সহজে ছাড়িতে চায়? তাহাতেই বিশেষ কষ্ট করিয়া, আমাকে রাজস্ব আদায় করিতে হইয়াছিল।”

“কিন্তু পূর্ণিয়া সেই বৎসরই লোকশূন্য হইয়াছে। পূর্ণিয়ার রাজস্বও সেই হইতে কমিয়া গিয়াছে।”

“পূর্ণিয়া লোকশূন্য হইলে, আমি কি করিব? আমি তো আর সকল লোকের প্রাণ বিনাশ করি নাই। অনেকানেক জমিদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে মালকাছারিতে আনিয়াছিলাম বলিয়া, তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রহারে আর কয়জন লোকই বা মরিয়াছে! আমার বোধ হয় না যে, দুই এক শত লোকের অধিক মরিয়াছে। তাহাতেও আমার কোন দোষ নাই। এই সকল লোক শত শত বেত্রাঘাতেও টাকা দিতে সম্মত হইল না। তখন কাঁটাশুদ্ধ বেলগাছের ডাল দিয়া ইহাদিগকে প্রহার করিতে আদেশ করিলাম। তাহাতেই অনেকের মৃত্যু হইল। কিন্তু এইরূপ না করিলে কি আর রাজস্ব আদায় হইত?”

“সে গত বিষয় লইয়া এখন তর্ক করিলে কি হইবে? আপনার ভয় নাই। হেষ্টিংস সাহেব আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোককে ছাড়িবেন না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ শত চেষ্টা করিয়াও আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবলিশ্ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরল কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর ১৭৭৬ সনের ৪ঠা জুলাইএর পত্রে হেষ্টিংস সাহেবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করেন না।”

“কোর্ট অব্ ডিরেক্টর গবর্ণর জেনেরলের উপর বিরক্ত হইয়াছেন কেন?”

“তাহারা অনেক বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।”

“কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন?”

“আমি বরখাস্ত হইয়া যে পুনর্ব্বার কার্য্যে মকরর হইয়াছি, তাহা বোধ হয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এখনও জানেন না। আমার হাতে রাজস্ব বিভাগের কার্য্যকর্ম্মের ভার রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা যার-পর-নাই অসন্তোষ প্রকাশ

করিয়াছেন *। এতদ্ভিন্ন মনোহর মুখুজ্যের মোকদ্দমার কাগজপত্র এবং থেকারে সাহেবের কার্য্যকলাপ দেখিয়া হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের উপর তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।”

“মনোহর মুখোপাধ্যায়ের কি মোকদ্দমা হইয়াছে ?”

“মনোহর মুখোপাধ্যায় বেটম্যান্ (Bateman) সাহেবের বেনিয়ান ছিল ; বেটম্যান্ সাহেব মুঙ্গেরের কলেক্টর ছিলেন। মুঙ্গের এবং ফরিদপুর এই দুই মহাল বেটম্যান্ সাহেব ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারাম—এই দুই নামে ইজারা লইয়াছিলেন। ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক ছিল না, কৃপারাম মনোহরের একজন অনুগত লোক। বেটম্যানের আদেশানুসারে মনোহর, ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের জামিন হইয়াছিল। বেটম্যান ঐ দুই মহালের জমিদারদিগকে উৎখাত করিয়া নিজেই মহাল ইজারা লইলেন। কিন্তু মহালের যাহা কিছু রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তিনি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব ১৩০০০৲ টাকা বাকী পড়িয়া রহিল। রায় রাইয়া ১৩০০০৲ টাকা বাকী থাকা রিপোর্ট করিলে পর তদন্ত আরম্ভ হয়। তখন মনোহরকে টাকার নিমিত্ত ধৃত করিলে, সে দরখাস্ত করিয়াছে যে, ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক নাই। ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের মোহর বেটম্যান্ সাহেব প্রস্তুত করাইয়া, তাঁহার নিজের কাছে রাখিতেন। বেটম্যানই ঐ দুই মহালের ইজারদার ছিলেন এবং তাঁহার কথানুসারে, সে জামিন হইয়াছিল †।”

“এ আর একটা বেশী কি ? এরূপ তো সর্ব্বত্র হইতেছে। তবে শ্রীহট্টে কি হইয়াছে ?”

শ্রীহট্টের গোলমালে স্বয়ং বারওয়েল সাহেব পর্য্যন্ত লিপ্ত আছেন বলিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সন্দেহ হইয়াছে। রাজস্ব-পরিদর্শন-সমিতি (Committee of Circuit) শ্রীহট্টের জমিদারীর রাজস্বের পরিবর্ত্তে ৬১ টা হাতী লইলেন বলিয়া বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির নামে ইজারাদারি পাট্টা কবুলতি লেখাপড়া হইয়াছিল, সে নামে কোন লোক শ্রীহট্টে নাই। শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট থেকারে সাহেবই একটা কল্পিত নামে ঐ সকল মহাল

* Vide note (1) in the appendix.

ইজারা লইয়াছিলেন। তিনি হাতীর মূল্যের বাবত পরিদর্শন-সমিতি হইতে ৩৩০০০৲ টাকা অগ্রিম নিয়াছিলেন। পরে যে কয়েকটা হাতী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা প্রায় সমুদায়ই পথে মরিয়া গিয়াছে। কেবল ১৬টী হাতী পাটনায় পৌছিয়াছে। শ্রীহট্টের এই গোলমাল সম্বন্ধে হেষ্টিংস ও বারওয়েল উভয়কে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন *।

"এ সকল গোলমাল শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। ইংরাজদিগের সাত খুন মাপ। কিন্তু আমি আপনার নিকট একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আমার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না। আর আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। আপনি যে জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটা পলাইয়াছে। কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।"

"আমি কখনও আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। এখন প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। দুই তিন বৎসর পরে এক একটা পরিবর্ত্তন না হইলে, এক একটা নূতন আইন জারি না হইলে, সরকারি কার্য্যকারকদিগের কোন লাভ হয় না। আপনি কিছুকাল এখানে অবস্থান করুন, দেখুন আগামী কল্য কৌন্সিলে কি নিয়ম অবধারিত হয়। তার পর যাহা হয় আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিব।"

তবে আজ বিদায় হইলাম। আজ হইতে আপনার সঙ্গে এই কথা রহিল—আপনিও আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না, আমিও আপনার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিব না। সে স্ত্রীলোকটার আমি এখনও অনুসন্ধান করিতেছি।"

এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম—রাজা দেবীসিংহ। যখন মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব সুবাদার ছিলেন, তখন রাজা দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইঁহার অত্যাচারে পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

সুতরাং মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর ১৭৭২ সালে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস পরিদর্শন-সমিতির (Committee of Circuit) সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন তিনি রাজা দেবীসিংহকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ১৭৭৩ সালে যখন কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাটনা এবং দিনাজপুরের রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত এক একটি প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল সংস্থাপিত হইল, তখন আবার হেষ্টিংস সাহেবই রাজা দেবীসিংহকে মুর্শিদাবাদ কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ প্রদেশের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়ম কিছুই বুঝিতেন না। মুর্শিদাবাদ কৌন্সিলের সমুদয় কার্য্যই দেবীসিংহ আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করিতেন। অনেকানেক জমিদারকে তাঁহাদের মহাল হইতে উৎখাত করিয়া নিজ বেনামিতে ঐই সকল মহাল ইজারা লইতেন। এতদ্ভিন্ন দেবীসিংহ ইংরাজদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আর একটি কৌশল করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই দশ বারটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের প্রয়োজন হইলেই, ইহাদের দুই একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ইহাতে দেবীসিংহের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু চিরকাল কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। ১৭৭৮ সালের কিছু পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল দেবীসিংহের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। দেবীসিংহ আর কোন প্রকারেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং এখন হেষ্টিংস সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিয়া, কলিকাতা আসিয়াছেন; এবং হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাগত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজস্ব আদায় বা ডাকাতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে পর, রাজস্ব আদায় উপলক্ষে ইংরেজগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ না করিলে এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনা পাঠকদিগের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের ভার নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তেই রহিল। কাপুরুষ মহম্মদ রেজা খাঁ অধিক রাজস্ব আদায় করিয়া ইংরাজদিগের প্রসন্নতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকারকালেই রাজা দেবীসিংহ পূর্ণিয়াবাসী প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগের উপর ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত জমিদার ও তালুকদারদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত ধৃত করিয়া কাছারীতে আনিতেন। কিন্তু নিষ্ঠুর অত্যাচারীর পদ প্রভুত্ব কখনও চিরস্থায়ী হয় না। অত্যাচারী রাজা কিংবা শাসনকর্ত্তাদিগকে অচিরাৎ পদচ্যুত হইতে হয়। অত্যাচারই রাজবিপ্লবের একমাত্র মূল কারণ।

১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের পরই মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলেন। বঙ্গের গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস রাজস্ব আদায়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গের রাজস্ব ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে জমিদারদিগের জমিদারীর জমা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদারগণকে তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারী হইতে উৎখাত করিয়া অনেকানেক কুচরিত্র বেনিয়ান এবং অন্যান্য দুষ্ট লোকের নিকট সেই সমস্ত জমিদারী ইজারা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ইজারাদার প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

পুরাতন জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে আপন আপন রায়তদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা রায়তদিগের উপর প্রায়ই

অত্যাচার করিতেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, রায়তগণ বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের জমিদারী কখনও সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে সকল অর্থ-গৃধ্নু বেনিয়ান এবং মহাজনদিগের নিকট হেষ্টিংস পুরাতন জমিদারদিগের জমিদারী ইজারা দিতে লাগিলেন, তাহারা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় কিছুই চিন্তা করিত না। দুই এক বৎসরের নিমিত্ত তাহারা এক এক পরগণার জমিদারী ইজারা লইত। সুতরাং তাহারা ইজারার মিয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বে ছলে বলে কৌশলে প্রজার নিকট হইতে যত টাকা পারে আদায় করিত। কোন গ্রামের দুই চারি ঘর রায়ত পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, সেই গ্রামবাসী অবশিষ্ট প্রজাদিগকে পলায়িতদিগের দেয় খাজনা আদায় দিতে হইত। এই সকল ইজারাদারের অত্যাচারে দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। ইজারাদারদিগের প্রহারে লোকের প্রাণ বিনাশ হইতে লাগিল।

কোন কোন ইজারাদার জমিদারী লাভ করিবার আশায় এত বৃদ্ধি জমা স্বীকার করিয়া ইজারা লইত যে, তাহাদের আর গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব দিন দিন আরও হ্রাস পাইতে লাগিল।

আবার কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস সাহেব তৎকালে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন, কালে তাহারাই আবার অতিশয় প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিল।

১৭৭২ সনের ১৪ই মে তারিখের নিয়মাবলী দ্বারা পাঁচ সন মিয়াদে দেশের সমুদয় জমি বন্দোবস্ত করা হইল। ইজারাদারদিগের সহিতই অধিকাংশ জমির বন্দোবস্ত হইল। হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং পরিদর্শন-কমিটীর (Committee of Circuit) অধ্যক্ষ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জিলার জমি সর্ব্বোচ্চ ডাকে বন্দোবস্ত করিলেন। এই বন্দোবস্তের পর প্রত্যেক জিলায় এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে কালেক্টর উপাধি প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিলেন।

কিন্তু কোন কোন জিলার কালেক্টর পুরাতন জমিদারদিগকে উৎখাত করিয়া বেনামীতে নিজে জমি ইজারা লইতেন; এবং সেই সকল জমিদারী হইতে যে কিছু রাজস্ব আদায় হইত, তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিতেন। তাঁহারা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব কিছুই দিতেন না। ইহাতেও কোম্পানীর অনেক রাজস্ব বাকী পড়িল। হেষ্টিংস নিজে উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং এই সকল ইংরাজ কালেক্টরদিগকে তাঁহার শাসন করিবার সাধ্য ছিল না। ইঁহাদিগকে শাসন করিতে গেলে তাঁহার নিজের দোষও বিলাতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইত। তৎপরে হেষ্টিংস অনন্যোপায় হইয়া কালেক্টরের পদ এবলিশ্ করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার আবার বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং এই সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর কার্য্যকলাপ পরিদর্শনার্থে পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, ঢাকা এবং কলিকাতা, এই ছয় জিলায় ছয়টি প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল অর্থাৎ প্রদেশীয় রাজস্ব-সমিতি সংস্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত রাজা দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদ প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইলেন, আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলিকাতার প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের দেওয়ান হইলেন। ইঁহারা দুই জনেই হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পাঁচসনা বন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলে পর নূতন বন্দোবস্তের সময় উপস্থিত হইল। প্রবিন্সয়াল কৌন্সিল সংস্থাপন-কালে জমি বন্দোবস্তের ভারও তাঁহাদের হস্তেই থাকিবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের হাতে বন্দোবস্তের ভার থাকিলে গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের কোন লাভ নাই; সুতরাং এখন প্রবিন্সয়াল কৌন্সিল এবলিশ্ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস সাহেব বারংবার কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাঁহার কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিলেন না।*

প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবলিশ্ করিবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। সিতাব রায়ের পুত্র কল্যাণসিংহ পাটনা বিভাগের অনেক জমি একজন লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। এদিকে কল্যাণসিংহের কর্ম্মচারী খেলারাম বাবু কলিকাতায় আসিয়া, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দ্বারা হেষ্টিংসকে চারি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিবার প্রস্তাব করিলেন। হেষ্টিংস কল্যাণসিংহের সহিতই জমি বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পাটনা প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল

*Vide (4) in the appendix.

লিখিয়াছেন যে কল্যাণসিংহ যে রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক জমায় জমি বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। ইহাতে হেষ্টিংস অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। কল্যাণসিংহের সহিত বন্দোবস্ত না করিলে চারি লক্ষ টাকা হস্তগত হয় না।

হেষ্টিংসের বিপক্ষদলের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইলেও ফ্রান্সিস্ ফিলিপ এবং হুইলার সাহেব সর্ব্বদাই হেষ্টিংস সাহেবের কার্য্যকলাপে প্রতিবাদ করিয়া কৌন্সিলের কার্য্যবিবরণ পুস্তকে সময় সময় যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তদ্দৃষ্টে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর হেষ্টিংসের অসদভিসন্ধি সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু অসচ্চরিত্র লোক প্রায়ই নির্লজ্জ হইয়া থাকে। কৌন্সিলের অপর মেম্বরগণ হেষ্টিংসকে স্পষ্টাক্ষরে কতবার উৎকোচগ্রাহী বলিয়া অপমান করিয়াছেন *। হেষ্টিংসের ইহাতেও লজ্জা বোধ হইত না। পাঁচসনা বন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইবামাত্র তিনি প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবলিশ্ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি কৌশলে যে প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭৭৬ সালে পুনর্ব্বার মফস্বল তদন্তের নিমিত্ত এণ্ডারসন্ এবং বোগেল্ সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংস মনে করিয়াছিলেন যে, ইঁহাদিগের তদন্তের রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

হেষ্টিংসের বিপক্ষদল তাঁহাকে উৎকোচগ্রাহী এবং পক্ষপাতী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের এইপ্রকার বলিবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। ১৭৭২ সালের রেগুলেসন্ (Regulation) দ্বারা নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ইংরাজ কালেক্টরগণ কিংবা তাঁহাদের অধীন কোন ব্যক্তি ইজারা লইতে পারিবেন না। কিন্তু হেষ্টিংসের বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার অন্যূন উনত্রিশটি পরগণা ইজারা লইয়াছিল। সেই সকল পরগণার পূর্ব্ব জমিদারদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারী হইতে একবারে উৎখাত করা হইয়াছিল। মুঙ্গেরের কালেক্টর বেটম্যান্ সাহেব ধান্দু বাহাদুর নামক একজন কল্পিত লোকের নামে মুঙ্গের এবং কারিকপুর পরগণার জমিদারী নিজে ইজারা

---

* Vide note (৫) in the appendix.

লইয়াছিলেন। থেকারে সাহেব শ্রীহট্টের জমিদারী জন্য এক কল্পিত নামে ইজারা লইলেন। থেকারে সাহেবের এই সকল প্রতারণামূলক কার্য্যে কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর বারওয়েল সাহেবও লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

থেকারের কুকার্য্য গোপন করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরল এবং বারওয়েল যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পত্রাদি দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার বর্দ্ধমানের রাণী এবং রাজসাহীর রাণী ভবানীর প্রতি হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেব অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন *। বারওয়েল সাহেব নিজের দোষ ক্ষালনার্থ বর্দ্ধমানের মহারাণীর নামে বিলাতে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বর্দ্ধমানের মহারাণীকে জঘন্য বেশ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন; পরম ধার্ম্মিক রাজা রামকৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া রটনা করিলেন †।

বস্তুতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বদাই এই দেশের সৎলোক অসৎলোক বলিয়া পরিচিত হইতেছে, এবং দেবীসিংহের ন্যায় দুশ্চরিত্র লোকেরাই রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে।

হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ দেশীয় পুরাতন জমিদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহার কথায় তখন কর্ণপাত করিলেন না। জমিদারদিগের ভূমিতে কোন স্বত্ব আছে বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতেন না। কিন্তু কালক্রমে ফ্রান্সিসের মতানুসারেই ভাবী গবর্ণর জেনেরল কর্ণওয়ালিস্‌কে কার্য্য করিতে হইল। এই ঘটনার বার চৌদ্দ বৎসর পরে ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস্ জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। ভূমিসংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই ইংরাজ রাজত্ব দৃঢ়ীভূত করিল। সেই সময় হইতে ইংরাজদিগের প্রতি দেশীয় লোকেরা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

Vide note (6) in the appendix.

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্বশুর ও পুত্রবধূ।

মাঘ মাস। সায়ংকাল সমুপস্থিত। প্রাণনগরের পথের পার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্র হইতে এক এক বোঝা খড় মাথায় লইয়া তিনটি কৃষক গৃহাভিমুখে যাই-তেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রের অধিকাংশ জমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত আবাদ হয় নাই। স্থানে স্থানে কেবল দুই একখণ্ড জমিতে ধানগাছের চিহ্ন দেখা যায়। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ক্ষেত্র হইতে অসংখ্য কৃষকদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু প্রাণনগর এখন প্রায় প্রাণিশূন্য হইয়াছে। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তে দুই একটী মাত্র কৃষকের ভগ্নকুটীর দেখা যায়। আজ কেবল তিনজন কৃষক সেই কুটীরাভিমুখে চলিয়াছে। ইহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই মুখ বিষাদে পরিপূর্ণ। যেরূপ ধীরে ধীরে হাঁটিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যেন ইহাদের শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বল নাই। অন্নকষ্টে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই কৃষকগণ যে রাস্তা পার হইয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, সেই রাস্তা দিনাজপুরের সহর হইতে বরাবর প্রাণনগরের জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঠাকুরগাঁও পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই কৃষক কয়েকটির বাটী প্রাণনগ-রের উত্তর প্রান্তে। কৃষকগণ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বের ক্ষেত্র হইতে আসিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বাড়ী যাইতেছিল। তিন জন কৃষকের মধ্যে একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ, সে অপর দুই জনের অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। যে দুই জন অগ্রে চলিয়াছে, তাহারা রাস্তা পার হইয়া পশ্চিম পার্শ্বের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৃদ্ধ কৃষক রাস্তায় উঠিবামাত্র দেখিল, একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব দ্রুত পদে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া, দক্ষিণ দিক্ হইতে বরাবর উত্তর মুখে চলিতেছে। বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ কৃষক বলিল "ঠাকুর গোসাঁই! শীঘ্র বাড়ী যান। আজ পাঁচ জন কোম্পানির বরকন্দাজকে উত্তর দিকে যাইতে দেখিয়াছি।"

বৃদ্ধ ত্রস্ত হইয়া বলিল, "পথে আরও একজন লোক আমাকে এ কথা বলিয়াছে, তাই বড় ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছি। বরকন্দাজদিগকে কোন্ দিকে যাইতে দেখিয়াছ ?"

কৃষক। আজ্ঞে সোজা রাস্তায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। আপনি এই ধানের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যান, তবেই তাদের আগে বাড়ীতে যাইতে পারিবেন। এদিকে যখন আসিয়াছে, তখন আপনার তল্লাসেই আসিয়াছে।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিক্ অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিল, বৃদ্ধ তখনও ক্ষিপ্তের ন্যায় দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে। "হা পরমেশ্বর! পুত্র গেল, ধন গেল, সম্পত্তি গেল, তবুও পাপ প্রাণ যায় না" এই বলিতে বলিতে অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টার পর একখানি পর্ণকুটীরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল।

এই পর্ণ-কুটীরের পশ্চিম দিকে আরও দুই খানি কুটীর ছিল। এই কুটীর তিন খানির চতুর্দ্দিকেই জঙ্গল, কুটীরে প্রবেশ করিতে হইলে জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে হয়, কিন্তু জঙ্গলের বাহির হইতে কুটীর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুটীরের দ্বারস্থ হইয়া বৃদ্ধ সত্রাসে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিবামাত্র, একটি রমণী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন। রমণী বোধ হয় দুই তিন মাস পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কেশ যুবতীর কেশকলাপের মত সুদীর্ঘ না হইয়া বালকদিগের মত খাটো। পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিলে ইঁহাকে বোধ হয় চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের মত দেখাইত। ইঁহার শরীর কৃশ, মুখে বালিকাসুলভ সরলতা প্রকাশিত। একটুকু লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন আপনার শারীরিক সৌন্দর্য্যরাশি গোপন করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা দ্বারা ইঁহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইঁহার সুদীর্ঘ নাসিকা, বিশাল নেত্র এবং চিত্রাঙ্কিত ভ্রূ-যুগল-পরিশোভিত মুখকমলে, বিষাদমিশ্রিত পবিত্রতা ও সরলতা উদ্ভাসিত হইয়া, সে মুখখানি এক অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়াছে। কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব যে সৌন্দর্য্যের মূল, বিষাদ, দারিদ্র্য, রোগ এবং বার্দ্ধক্য সে সৌন্দর্য্য সহসা বিনষ্ট করিতে পারে; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের ছায়া, তাহা অবস্থান্তর দ্বারা বিকৃত হয় না। এ রমণীর সৌন্দর্য্য ইঁহার হৃদয়স্থিত সদ্ভাবসম্ভূত; সুতরাং এ নিত্য সৌন্দর্য্য।

এই পরমা সুন্দরী রমণীর বয়স পঁচিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, কিন্তু ইনি দেখিতে বালিকাসদৃশী। রমণী দ্বারদেশে আসিবামাত্র বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল,—

"মা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুরাত্মা দেবীসিংহ বোধ হয় আবার আমার অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছে। আজ ভিক্ষা করিতে গিয়া, পথে শুনিলাম যে, এই দিকে চারি পাঁচ জন কোম্পানির বরকন্দাজ আসিয়াছে।"

"তার জন্য আপনি এত ভীত হইয়াছেন কেন? আমাদের তো সকলই নিয়াছে। এখন আর আমাদের কি কবিবে?"

"ধরিয়া নিয়া কয়েদ রাখিবে।"

"রাখে কয়েদ, কারাগারেই থাকিব। বিষয়, সম্পত্তি, সম্ভ্রম—সকলই গিয়াছে। এখন একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই হয়।"

"মা! দেবীসিংহ কিরূপ নর-পিশাচ, তাহা তুমি জান না। তাহার হস্তে পড়িলে আর কি কোন যুবতীর ধর্ম্মরক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে? আমাকে কয়েদ রাখিবে বলিয়া আমি কিছুই ভয় করি না; কিন্তু তোমাকে যদি ধৃত করিয়া নিয়া যায়, তাহা হইলে আমার ইহকাল পরকাল সকলই নষ্ট হইবে। তাই আমি মনে করিয়াছি যে, আজ আমি নিজেই ধরা দিব। তুমি রূপা, জগা এবং বুড়া দাসীকে সঙ্গে করিয়া যত শীঘ্র পার জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন কর।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া যুবতী আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধের চরণ ধরিয়া বলিলেন,—

"আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। আপনাকে যেখানে কয়েদ রাখিবে, আমি সেইখানেই কয়েদ থাকিব। তাহা হইলে অন্ততঃ আপনার নিকট থাকিতে পারিব। আপনি যখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইবেন, তখন আপনার মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিলে আমি কারাগারে থাকিয়াও সুখী হইব। কাহার জন্যই বা এ পাপ জীবন ধারণ করিতেছি? বিধবার জীবন বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু এই দুঃখ-বিপদের মধ্যেও যখন ক্ষুধার সময় আপনাকে দুইটী অন্ন রন্ধন করিয়া দিতে পারি, তৃষ্ণার সময় আপনাকে এক ফোঁটা জল দিতে পারি, আপনি ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আপনার কাছে বসিয়া যখন একটু বাতাস করি, তখন আমি পরম সন্তোষ লাভ করি। এই ১২ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি, এখন

আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও স্থানান্তরে থাকিতে পারিব না। আপনাকে আর শ্বশুর বলিয়া মনে হয় না। মাতার নিকট কন্যা যেমন অকপটে মনের সকল ভাব ব্যক্ত করে, আমি আপনার নিকট সেইরূপ মনের সকল কথা বলিতেছি। আপনি আমার শ্বশুর নহেন, আমার পিতা নহেন, আপনি আমার মা।”

“বাছা! তুমি কারাগারে যাইবে, ইহা কি আমার সহ্য হয়? পুত্রশোক হইতেও তোমার অপমানে আমার হৃদয় শতগুণে দগ্ধ করিবে। তুমি এই মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া পলায়ন কর।”

“এখন আর আমাদের মান অপমানের ভয় কি? এখন আর আমাদের লোকলজ্জারই বা ভয় কি? আমাদের বিষয় সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম—সকলই গিয়াছে। এখন যদি কোন ভয় থাকে, সে কেবল ধর্ম্মভয়। ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের চক্ষে নির্দ্দোষী হইলেই হইল। আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকলজ্জার ভয় মনে স্থান দিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনাকে আজ ধৃত করিলে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে প্রবেশ করিব।”

“বাছা! আমার সঙ্গে যদি তোমাকেও ধরিয়া লইয়া যায়, তবে তোমাকে তো আমার নিকট থাকিতে দিবে না। তোমাকে যদি কয়েদ রাখে, তবে স্থানান্তরে রাখিবে। কিন্তু তোমাকে ধরিতে পারিলে দেবীসিংহ নিশ্চয়ই তোমাকে কোন কামাসক্ত ইংরাজের নিকট প্রেরণ করিবে। দেবীসিংহ অনেকানেক কামাসক্ত ইংরাজের অনুগ্রহ ক্রয় করিবার জন্য ভদ্র কুলমহিলাদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধা দাসী এবং আমার এই বিশ্বস্ত প্রজা দুইটীকে সঙ্গে লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে চলিয়া যাও।

যুবতী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গেলেও তাঁহার নিকট থাকিতে পারিবেন না। তখন নিরাশ হইয়া অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

“সহমৃতা হওয়াই আমার উচিত ছিল। আপনার পুত্রের সকল কথাই এখন ঠিক হইল। তখন আপনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না, আর আমি তো অজ্ঞান—স্ত্রীলোক—আমি সে সকল কথার মর্ম্ম তখনও কিছু বুঝিতে পারিতাম না, এখনও কিছু বুঝিতে পারি না।”

"মা! বাছার সে সকল কথা মনে হইলে আমার বোধ হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কিংবা অপর কোন মহাপুরুষ আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নহিলে, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা বাছা কেমন করিয়া বলিল? বাছা যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছে, সকলই ফলিয়াছে। আমি তাহার কথানুসারে কাজ করি নাই বলিয়াই বুঝি, বাছা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! তোমার শাশুড়ী পরমা সাধ্বী ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার পুণ্যফলেই ভগবান্ শ্রীহরি আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাছা আমাকে বারংবার বলিয়াছে 'আপনার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে; আপনার সদাব্রত, আপনার অতিথিশালা, আপনার দানধর্ম্ম, কখনই আপনাকে এই বিনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।' হায়! হায়! বাছার সকল কথাই পূর্ণ হইল।"

"আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার কাশীধামে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি জঙ্গলের মধ্যেই কয়েক দিন অপেক্ষা করিব। যদি চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তবে আপনি এখানে ফিরিয়া আসিলেই একত্র হইয়া কাশীধামে চলিয়া যাইব। আর যদি শুনিতে পাই যে, আপনার প্রাণবিনাশ করিয়াছে, তবে স্বামীর কুশপুত্তল নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে নিশ্চয় চিতারোহণ করিব। সহমরণ ভিন্ন আর আমার দ্বিতীয় পথ নাই।"

"মা! আমি এক মুহূর্ত্তও তোমাকে আর দিনাজপুরের সীমার মধ্যে থাকিতে দিতে পারি না। দেবীসিংহ কি জানে না যে, এখন আর আমার ধন সম্পত্তি কিছুই নাই। সেই তো আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। তবে এখন আবার আমাকে কি জন্য ধৃত করিতেছে, তাহা কি বুঝিতে পার না? হা পরমেশ্বর! পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম।—এও কি মানুষের সহ্য হয়!"

"তবে কি জন্য ধৃত করিতে চাহে?"

বৃদ্ধ। আমার দুরদৃষ্ট; সে কথা আমি কোন্ পোড়ার মুখে তোমার নিকট বলিব! বোধ হয়, কোন দুষ্ট লোকের নিকট শুনিয়াছে যে, তুমি পরমা সুন্দরী। তাই কেবল তোমাকে ধৃত করিবার নিমিত্তই এই সকল চক্রান্ত করিতেছে। আমি শুনিয়াছি যে, মুর্শিদাবাদের কোন এক ভট্টাচার্য্যের বিধবা স্ত্রীকে ধৃত করিয়া দেবীসিংহ গঙ্গাগোবিন্দসিংহকে দিবে বলিয়া

স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু সে ব্রাহ্মণকন্যা দেবীসিংহের গৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। এখন তোমাকে সেই ব্রাহ্মণকন্যার পরিবর্ত্তে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট প্রেরণ করিবে। তুমি এক মুহূর্ত্তও এখানে বিলম্ব করিও না, এখনই পলায়ন কর।"

(সক্রোধে) "দেবীসিংহ, কি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কোনও সাধ্য নাই, তাহারা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে। আপনার পুত্র আমাকে বরাবরই বলিতেন যে, রমণীগণ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না করিলে জগতে এমন কোন লোক নাই যে, তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে। আমি তখন তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহার সঙ্গে কত তর্ক করিয়াছি। গ্রে সাহেবের লোকদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে কত নিষেধ করিয়াছি। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া আমার সঙ্গে আর কথা বলিতেন না। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই সত্য। গত ১২ বৎসর যাবৎ নানা বিপদ্ এবং বিবিধ সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়া এখন আমি নিজেই দেখিতেছি যে, নারীজাতির ধর্ম্মরক্ষার ভার স্বয়ং ভগবান্ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ব্বলের বল যে একমাত্র ঈশ্বর, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মবিসর্জ্জন না করিলে, কে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে? কিন্তু আমার আরও দুঃখের বিষয় হইল যে, এখন এই হতভাগিনীর নিমিত্ত আপনাকে না জানি কতই প্রহার করে!"

রমণী এই কথা বলিবামাত্র উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। কিছুকাল পরে যুবতী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"হা পরমেশ্বর! এই হতভাগিনীর নিমিত্ত এই পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে! এ হতভাগিনীকে কেন তুমি রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছিলে? যাঁহার নিমিত্ত নারীজাতির রূপ—যাঁহার নিমিত্ত সৌন্দর্য্য—তিনি তো আমার চলিয়াই গিয়াছেন; তবে রূপ ও সৌন্দর্য্যের আর প্রয়োজন কি? এই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিব। শরীর ক্ষত বিক্ষত করিব"—

এই বলিয়া রমণী আপনার মস্তকের কেশ ছিন্ন করিতে লাগিলেন, বারংবার সজোরে ললাটে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সস্নেহে রমণীর হস্ত ধরিয়া রাখিলেন। "আত্মঘাতিনী হইবার প্রয়োজন নাই, আত্মঘাতিনী হইবার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রমণী কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আবার আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"হা পরমেশ্বর! কেন আমি সহমৃতা হইলাম না? তখন সহমৃতা হইলেই সকল যন্ত্রণা—সকল কষ্ট—দুর হইত।"

আবার শ্বশুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সেও তো আপনারই দোষ। "আপনার পুত্র যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহার একটী কথাও মিথ্যা হইল না। হা পরমেশ্বর! আমি দেবতা পতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে তখন চিনিতে পারি নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন 'কর্ম্মফল কেহ এড়াইতে পারে না। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়।' আপনি তখন আমাকে সহমরণব্রতাবলম্বন করিতে দিলেন না। এখন তাহারই কর্ম্মফল আপনাকে ভোগ করিতে হইবে।"

"মা! এ সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা যে আমার কর্ম্মফল, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন আমি তোমাকে কাহার মৃত শবের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে বলিব? দুরাত্মা দেবীসিংহের লোকের প্রহারে সে বৎসর এক দিনেই প্রায় বিশ ত্রিশ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। কাঁটাশুদ্ধ বেল গাছের ডাল * দিয়া বারংবার আঘাত করিয়া সেই সকল লোকের প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। যে সকল লোকের মুখের উপর আঘাত পড়িয়াছিল, তাহাদিগের মৃত শব দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিবার সাধ্য ছিল না। তাহাদের মুখাকৃতি বিকৃত হইয়াছিল। আমার বাছার মৃত শব আমি শত চেষ্টা করিয়াও বাছিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। জামাতার মৃত দেহ দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং প্রাণসমা স্বর্ণ-প্রতিমা প্রভাবতী সহমৃতা হইবার বাসনা প্রকাশ করিবামাত্র, আমি তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিলাম। যদি বাছার আমার মৃত দেহ নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারিতাম, তবে তোমাকে অম্লানবদনে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করিতে অনুমতি করিতাম। এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার নিমিত্ত কি আমি কখনও তোমাকে এ সংসারে রাখিতাম? তোমাকে দেখিলেই পুত্রশোকে আমার বুক ফাটিয়া

* Vide note (8) in the appendix.

যায়; পুত্রশোকানল শতগুণে জ্বলিয়া উঠে। মা! পুত্রশোক কি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিবে? তোমার তো কখনও সন্তান হয় নাই? পুত্র-শোকানল কখনও নির্ব্বাণ হয় না। বোধ হয় এ শোকানল চিতানলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, যখন শরীরকে ভস্মীভূত করিবে, তখনই কেবল এ শোক বিস্মৃত হইতে পারিব।"

"আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার মৃত দেহের অনুসন্ধান করিলে, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত দেহ বাছিয়া বাহির করিতে পারিতাম। তাঁহার এক খান হস্ত দেখিলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম যে, এই তাঁহার হস্ত। তাঁহার মস্তকের একটী কেশ আমি শত শত লোকের মস্তকের কেশ হইতে বাছিয়া বাহির করিতে পারিতাম। তাঁহার হাতের একটী অঙ্গুলি দেখিলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারিতাম যে, এই তাঁহার অঙ্গুলি।"

"এ অসম্ভব কথা। সকল লোকের অঙ্গুলিই একপ্রকার। মুখাকৃতি না দেখিলে কি মানুষকে চেনা যায়?"

"আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, তাঁহার হাতের একটী অঙ্গুলি দেখিলে আমি তাঁহার মৃত দেহ বাছিয়া বাহির করিতে পারিতাম। কেবল আমি কেন? আমার বোধ হয় প্রত্যেক পতিপ্রাণা রমণী পতির একগুচ্ছ কেশ, অপরাপর লোকের মস্তকের কেশ হইতে বাছিয়া বাহির করিতে পারেন।"

"মা! তবে কি পিতৃস্নেহ অপেক্ষাও পত্নীর প্রেমের এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি? পিতৃ-মাতৃস্নেহও কি পত্নীর প্রেমের নিকট পরাস্ত হয়?"

"পিতৃমাতৃস্নেহ অপেক্ষা সাধ্বীর প্রেমের সমধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে কি না, তাহা আমি নিজে কিছুই বুঝি না; কিন্তু আপনার পুত্র এক দিন বলিয়াছিলেন যে, সাধ্বীর নিঃস্বার্থ প্রেম দুইটি স্বতন্ত্র আত্মার সম্মিলনসম্ভূত। সুতরাং পুণ্যবতী মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহের ন্যায়, সাধ্বীর প্রেম কোনও অবস্থায়ই রূপান্তরিত হয় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মাতৃস্নেহ এবং সাধ্বীর প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভূত হয়।"

"বাছা কি তোমার সঙ্গেও এ সকল কথা, বলিত? হা! বাছার আমার সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ এবং ধর্ম্মালোচনা ছিল। এত অল্প বয়সে বাছা কত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিল!"

'তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট শাস্ত্রের কথা বলিতে ভালবাসিতেন।

কিন্তু আমি তাঁহার কথা কিছু বুঝিতাম না, তাঁহার কথা তখন মন দিয়া শুনিতামও না। কখনও কখনও না বুঝিয়া তাঁহার সহিত অনর্থক তর্ক বিতর্ক করিতাম। তাহাতেই আমার উপর তাঁহার ভালবাসার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু তথাচ তিনি আমায় কখনও কোন কষ্ট প্রদান করেন নাই। কখনও একটি দুর্ব্বাক্যও বলেন নাই।"

"বাছা আমার কোনও দিন কাহাকেও কষ্ট প্রদান করে নাই। অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখিলে বাছার চক্ষে জল পড়িত। হা পরমেশ্বর! এমন সুপুত্রের শোক কি কেহ সহ্য করিতে পারে! আমি নিজে কেন মরিলাম না। যখন দেবীসিংহের লোক আমাকে ধৃত করিতে আসিল, আমি পলায়ন করিলাম! বাছা নিজে হাজির হইয়া বলিল 'আমার বৃদ্ধ পিতাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে প্রাণ হারাইবে; আমার নাম প্রেমানন্দ গোস্বামী, আমি নিজে হাজির হইতেছি।'

আহা, বাছার আমার কি অদ্ভুত সাহসই ছিল! তখন যদি আমি হাজির হইতাম তো আর আমার বাছাকে প্রাণ হারাইতে হইত না। মা! আজ আমি আমার পুত্রের ন্যায়ই কার্য্য করিব। আমি নিজেই ধরা দিব। তুমি শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন কর।"

শ্বশুরের কথা শুনিয়া রমণী কিছুকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পলায়ন করাই স্থির করিলেন। যে কুটীরে বসিয়া শ্বশুর ও পুত্রবধূ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে পশ্চিম-দিকে আর দুইখানি কুটীর ছিল। তাহার একখানি কুটীরে একটি বৃদ্ধা দাসী বাস করিত। অপর কুটীরে আর দুইটি লোক ছিল। বৃদ্ধাকে সকলে "স্বরূপের মা" বলিয়া ডাকিত। আর অপর দুইটি লোকের একটির নাম জগা, দ্বিতীয়ের নাম রূপা। জগা এবং রূপা আহারের আয়োজনার্থ কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়াছিল। বৃদ্ধা গৃহের অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। বৃদ্ধ বৈষ্ণব ইহাদিগকে ডাকিবামাত্র, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নিকট বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের বাক্যাব-সানে স্বরূপের মা, জগা এবং রূপা যুবতীকে সঙ্গে করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুটীর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে প্রাণনগরের রাস্তার উপর আসিলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইঁহার হরি-সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র

চারি পাঁচ জন লোক, "আজ এক শালাকে পাইয়াছি—শালা এই জঙ্গলের মধ্যেই কোনও স্থানে ছিল" এইরূপ বলিতে বলিতে বড় উল্লাসের সহিত দৌড়িয়া আসিয়া বৃদ্ধকে ধরিল এবং "কোথায় ধান্য লুকাইয়া রাখিয়াছিস্, দেখাইয়া দে" এই বলিয়া ধমকাইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

রামানন্দ গোস্বামী।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম রামানন্দ গোস্বামী। আর যে রমণীর সঙ্গে তিনি কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার নাম দেবী সত্যবতী। সত্যবতী দেবী রামানন্দের পুত্রবধূ। মালদহের অন্তর্গত গৌড়নগরে রামানন্দ গোস্বামীর পৈতৃক বাসস্থান ছিল। মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ণিয়া এই চারি জিলার অনেকানেক জমিদার এবং সমৃদ্ধিশালী লোক রামানন্দ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। এই চারি জিলাতেই রামানন্দের অনেক ব্রহ্মত্র জমি ছিল। তাঁহার সমুদয় ব্রহ্মত্র জমির বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকার ন্যূন ছিল না। রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারগণ এবং ধনাঢ্য লোকেরা রামানন্দ গোস্বামীকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। অনেকানেক জমিদার বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে, গোস্বামী মহাশয়কে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, দশ বারটা হস্তী, আট নয়টা অশ্ব এবং বিশ পঁচিশ জন ভৃত্য তাঁহার বাড়ীতে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার অবকাশও পাইতেন না। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। প্রত্যেক বৎসর এক এক বার সমুদয় শিষ্যের বাড়ী যাইতেও সমর্থ হইতেন না।

রামানন্দ গোস্বামী কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সর্ব্বত্রই এক জন পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বাড়ীতে একটী বৃহৎ অতিথিশালা ছিল। তাঁহার বদান্যতা এবং দানশীলতা নিবন্ধন মালদহে কাহাকেও কখনও অন্ন-কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। দেশের কোন দুঃখী দরিদ্রের অন্নাভাব

হইলেই পরমবৈষ্ণব রামানন্দ তৎক্ষণাৎ তাহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতেন।

রামানন্দের সহধর্ম্মিণী সুনীতি দেবী অত্যন্ত সদাচারিণী ছিলেন। তিনি সুসন্তান কামনা করিয়া বিবিধ ব্রতাবলম্বন এবং সদনুষ্ঠান করিতেন। ভদ্রাসন হইতে এক ক্রোশের মধ্যে কেহ অভুক্ত থাকিলে তাহাকে অন্ন প্রদান না করিয়া সুনীতি দেবী নিজে জল গ্রহণ করিতেন না। ভদ্রাসন হইতে এক ক্রোশের মধ্যে কোন দীন দুঃখী অন্নাভাবে অভুক্ত রহিয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় দশ বার জন দাস দাসী চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইত। বিশেষ অনুসন্ধানের পর সেই সকল দাস দাসী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন বলিত যে, বাড়ী হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কোনও দিকেই এক ক্রোশের মধ্যে কোনও অভুক্ত লোক নাই, কিংবা যাহারা অভুক্ত ছিল, তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ করা হইয়াছে, তখন সুনীতি দেবী স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া অগ্রে স্বামীকে আহার করাইতেন; পরে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট নিজে খাইতেন। পরম বৈষ্ণব রামানন্দ আমিষ ভক্ষণ করিতেন না বলিয়া সুনীতি দেবীও পতিব্রতা-ধর্ম্মানুরোধে আহার সম্বন্ধেও পতির পদানুসরণ করিতেন।

রামানন্দের দুইটীমাত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। একটী পুত্র, একটী কন্যা। তাঁহার পুত্রের নাম প্রেমানন্দ গোস্বামী। কন্যার নাম প্রভাবতী দেবী। রামানন্দ নিজে বড় একটা অধিক শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রেমানন্দ, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সমুদয় পুস্তকখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সুখে দিনাতিপাত হয় না। বিপদ্‌রাশি অদৃশ্য-ভাবে সকলের মস্তকের উপর ঝুলিতেছে। কখন যে কাহার মস্তকোপরি নিপতিত হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে সময়ে সময়ে লোকের মনে এই একটী প্রশ্নের উদয় হয় যে, এইরূপ ধার্ম্মিক পরিবারকেও কি মঙ্গলময় পরমেশ্বর বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন না? এই ধার্ম্মিক পরিবারকেও যদি ঘটনা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিপৎ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, তবে কি প্রকারে পরমেশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের

উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানচক্ষে যাঁহারা মানবমণ্ডলীর ইতিহাস অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হইবার বড় সম্ভাবনা নাই।

রামানন্দ গোস্বামী অতি সমারোহের সহিত পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের বিবাহের দুই বৎসর পরেই, বোধ হয় ১৭৬০ কি ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুনীতি দেবী পরলোক গমন করিলেন। সুনীতির মৃত্যুকালে প্রেমানন্দের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ এবং তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরমাত্র ছিল। প্রভাবতীর বয়স চৌদ্দ বৎসরের অধিক হয় নাই। প্রভাবতী স্বামী সহ পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিলেন; এবং জননীর মৃত্যুর পর পিতৃগৃহের সমুদয় ঘরকন্নার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল।

এই সুখী পরিবারের জীবন-তরী এখন পর্য্যন্তও অনুকূল শান্তি-বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া আনন্দ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে অমৃতসাগরাভিমুখে চলিতেছিল। কিন্তু এক একটী মনুষ্যের জীবন এ সংসারের অপরাপর জনসাধারণের জীবনের ঘটনার সহিত এত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, অপরের মঙ্গলামঙ্গলের ফল, অন্যান্য লোকের সদসৎ কার্য্যের ফলাফল প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে।

রামানন্দ গোস্বামীর বর্ত্তমান দুরবস্থা যে প্রকারে সমুপস্থিত হইল, তাহা বিবৃত করিতে হইলে, কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা উচিত।

সিরাজের সিংহাসন-চ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল। রোম সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় যদ্রূপ প্রেটরীয়ান গার্ড নামক সৈনিকদল রোমের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিল, সেইরূপ ইংরাজগণও বঙ্গের প্রেটরীয়ান গার্ড হইয়া উঠিলেন। রোমের শেষাবস্থায় রোম রাজ্যের রাজা মনোনীত করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও প্রেটরীয়ান গার্ড অধিকার করিলেন। বঙ্গদেশেও নবাব মকরর এবং নবাব পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা ইংরাজেরাই সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব কাপুরুষ মীর জাফর ইংরাজদিগের ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। ইংরাজগণ এই সুযোগে দেশ একবারে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহারা দেশীয় জনসাধারণের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

গ্রে নামক একজন জঘন্য চরিত্রের ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

মালদহের বাণিজ্য-কুঠীর অধ্যক্ষ ছিল। মালদহবাসী রামনাথ দাস নামক একজন দুশ্চরিত্র নরপিশাচ গ্রে সাহেবের বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত হইল। ইংরাজেরা দেশের কোন সচ্চরিত্র লোককে কখনও তাঁহাদের বেনিয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। এ দেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ব্যভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি কোনপ্রকার কুকার্য্য করিতে যাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইত না, সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্য যাহারা অম্লানবদনে সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইত, ইংরাজেরা তাহাদিগকেই কেবল বিশেষ কার্য্যদক্ষ মনে করিয়া, তাহাদিগের বাণিজ্য-কুঠীর গোমস্তা কিংবা বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত করিতেন।

মালদহ জিলায় রামনাথের ন্যায় প্রবঞ্চক এবং ধূর্ত্ত লোক অতি অল্পই ছিল। সুতরাং গ্রে সাহেব রামনাথকে আপন বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠীর সাহেবেরা কোম্পানির পক্ষ হইতে, বিলাতে কিংবা চীন দেশে প্রেরণার্থ, বঙ্গ দেশের কোন বণিকের নিকট হইতে কোন পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিলে, বিক্রেতাকে নগদ মূল্য প্রায়ই দিতেন না। * কোম্পানির হিসাবে টাকা খরচ লিখিয়া, সেই টাকা দ্বারা বাণিজ্য-কুঠীর সাহেবেরা তাঁহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যের নিমিত্ত অন্য একটা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন; সেই পণ্যদ্রব্যের উপর দেড়গুণ কি দ্বিগুণ মুনফা ধরিয়া মূল্যস্বরূপ তাহা পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাকে "গছাইতেন"। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পুরাতন পত্রাদির মধ্যে এই ব্যবহার "গছান প্রথা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই "গছান প্রথা" নিবন্ধন বঙ্গের শত শত বাণিজ্যব্যবসায়ী লোক একেবারে নিরন্ন হইয়া পড়িল। ইহাতে নিরন্ন না হইবেই বা কেন? একজন তন্তুবায়ের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠীর অধ্যক্ষ এক হাজার টাকার বস্ত্র ক্রয় করিলেন। কিন্তু তাহাকে একটী পয়সাও নগদ না দিয়া, অধ্যক্ষ সাহেব সেই হাজার টাকা দ্বারা তাঁহার নিজের বাণিজ্যের নিমিত্ত হাজার মণ তামাক ক্রয় করিলেন। পরে উক্ত এক হাজার মণ তামাকের মূল্য দুই হাজার টাকা ধরিয়া তাহা তন্তুবায়কে গছাইয়া দিলেন। তন্তুবায়কে এক হাজার মণ তামাকের

* Vide note (9) in the appendix.

পরিবর্ত্তে এক হাজার টাকার বস্ত্র এবং নগদ এক হাজার টাকা দিতে হইল। আবার কোন ব্যক্তিকে এইরূপ তামাক গছাইলে পর যদি নগদ টাকা দিতে তাহার দুই এক মাস বিলম্ব হইত, তবে ইংরাজদের বাণিজ্য-কুঠীর গোমস্তাগণ তৎক্ষণাৎ সিপাহী সঙ্গে করিয়া যাইয়া তাহার ঘরবাড়ী লুঠ করিত, তাহার ঘরের স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিত।

নবাবের কর্ম্মচারিগণ ইংরাজদিগের এই অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেন না। আবার বাণিজ্য-কুঠীর সাহেবেরা বলিতেন যে, এইরূপ "গছান সুপ্রথা দ্বারা" দেশীয় লোকদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কারণ, তাহারা বিবিধ বিষয়ের বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। একজন তন্তুবায় কেবল বস্ত্রের ব্যবসা করিতেছে, তাহাকে তামাক গছাইলে অনায়াসে সে তামাকের বাণিজ্যও শিক্ষা করিতে পারিবে। এই প্রকারে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বজনহিতৈষী ইংরাজ মহাত্মগণ নিঃস্বার্থ প্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়া তন্তুবায়দিগকে তামাকের বাণিজ্য শিখাইতেন, তামাক-ব্যবসায়ীকে লবণের ব্যবসা শিখাইতেন, লবণব্যবসায়ীকে চাউলের বাণিজ্য শিখাইতেন। কিন্তু এ শিক্ষাপ্রদান নিবন্ধন দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল।

এতদ্ভিন্ন অনেকানেক ইংরাজ দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহার মূল্য একেবারেই দিতেন না। দেশীয় বণিক্ ইংরাজদিগের নিকট পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে কিংবা ফরাসী কি ওলন্দাজদিগের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে, ইংরাজ তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন, তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে বেইজ্জত করিয়া তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া দিতেন।

মালদহে গ্রে সাহেব এবং তাঁহার বেনিয়ান এই প্রকারে দেশীয় বণিক্‌দিগের সর্ব্বস্বান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মূলধন না থাকিলে কিরূপে বাণিজ্য করিতে হয়, সে শিক্ষার ভার জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেব গ্রহণ করিলেন। এই তিন মহাত্মার বাণিজ্যের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের কোনও সংস্রব ছিল না। জনষ্টোন, হে এবং উইলিয়ম বোল্ট এজমালিতে পুর্ণিয়া জিলায় বাণিজ্যের দোকান খুলিলেন। ইঁহাদের গোমস্তা রামচরণ দাস দেশীয় বণিক্‌দিগের নিকট হইতে প্রায়ই বাকীতে জিনিস ক্রয় করিত। ইঁহাদিগের বাণিজ্যপ্রণালী অতি চমৎকার ছিল। ইঁহারা হয় তো

কোনও তন্তুবায়ের নিকট বাকীতে এক হাজার টাকার বস্ত্র ক্রয় করিতেন, পরে সেই বস্ত্রের মূল্য দেড় হাজার টাকা ধরিয়া কোনও তামাকব্যবসায়ীকে গছাইয়া, তাহার নিকট হইতে দেড় হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ আদায় করিতেন। সেই দেড় হাজার টাকা হইতে হাজার টাকা মুনফার বাবত হাতে রাখিয়া ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পূর্ব্বোক্ত তন্তুবায়কে প্রদান পূর্ব্বক আবার দুই হাজার টাকার বস্ত্র বাকীতে তাহার নিকট হইতে আনিতেন। ঈদৃশ উপায় অবলম্বন করিলে মূলধন না থাকিলেও বাণিজ্য চালাইবার কোন বাধা হয় না। মূলধন না থাকিলে কিরূপে বাণিজ্য করিতে হয়, জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের প্রসাদে পূর্ণিয়ার অধিবাসিগণ বিলক্ষণ রূপে তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামানন্দ গোস্বামীর পূর্ণিয়া এবং মালদহ এই দুই জিলাতেই অধিক ব্রহ্মত্র জমি ছিল। রামানন্দের ব্রহ্মত্র জমির প্রজাগণ মধ্যে অনেকানেক বাণিজ্যব্যবসায়ী লোক ছিল। রামানন্দ অত্যন্ত প্রজাবৎসল ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইংরাজ বণিক্‌দের ঈদৃশ অত্যাচার হইতে কিরূপে আপনার প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মালদহে গ্রে সাহেবের বেনিয়ান রামনাথ দাস এবং পূর্ণিয়ার জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের গোমস্তা রামচরণ দাসকে অনেক উৎকোচ প্রদান করিয়া বশীভূত করিলেন। তাহারা রামানন্দের প্রজাদিগের উপর বড় অত্যাচার করিত না। এইরূপে রামানন্দ আপন প্রজাদিগকে কিছুকালের নিমিত্ত ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু রামানন্দের বিশ পঁচিশ ঘর প্রজা ভিন্ন পূর্ণিয়া ও মালদহের অপর সহস্র সহস্র লোক গ্রে সাহেব ও তাঁহার বেনিয়ান রামনাথ, এবং জনষ্টোন, হে, বোল্ট, ও তাঁহাদের গোমস্তা রামচরণের অত্যাচারে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল। কত শত লোক যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না।

রামানন্দের পুত্র প্রেমানন্দ স্বদেশীয় লোকদিগকে ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া সর্ব্বদাই অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন। যেরূপ সহৃদয়া, সদাচারিণী, শান্তা, সুশীলা জননীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমানন্দের হৃদয় যে এইরূপ অত্যাচার দর্শনে বিগলিত হইবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠীর লোকেরা

আজ কাহারও বাড়ী লুঠ করিতেছে, কাল একজন গরীব তন্তুবায়রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে; এইরূপ ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া প্রেমানন্দ এই অত্যাচারের অবরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাণিজ্য-কুঠীর লোকের সহিত ঝগড়া করিতে দিলেন না। রামানন্দ বলিলেন "বাছা! কোম্পানির লোকেরা আমার কোনও প্রজার উপর তো অত্যাচার করিতেছে না, আমি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া গ্রে সাহেব ও রামনাথকে বশীভূত করিয়াছি। এখন অন্যের নিমিত্ত তুমি তাহাদিগের সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইয়া আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিতে চাও?"

পিতার এই কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ বলিলেন "এই দেশব্যাপী অত্যাচার নিবারণ করিতে যত্ন না করিলে, এ অত্যাচার ক্রমে দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সকলকেই ভস্মীভূত করিবে। আজ অন্যান্য দশ জনের উপর অত্যাচার হইতেছে, আর দুই দিন পরে আমাদের উপরও এইরূপ অত্যাচার হইবে। বিশেষতঃ নিরপরাধ অত্যাচার-নিপীড়িত লোকদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে মনুষ্যের ধর্ম্মরক্ষা হয় না।"

রামানন্দ বলিলেন যে, আমাদের উপর রামনাথ কি গ্রে সাহেব কখনও অত্যাচার করিবে না। আমি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছি। এখন অন্যের জন্য যদি তুমি রামনাথের সহিত শত্রুতা কর, তবে কল্যই তাহারা আমাদের উপরও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। অন্যের নিমিত্ত তুমি আপনার সর্ব্বনাশ করিও না।

পিতার এই কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন— "এ দেশের প্রত্যেক লোকের উচিত যে, তাহারা আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও এ অত্যাচার নিবারণ করে। এখন এই অত্যাচারের বীজ সমূলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা না করিলে, এ ভীষণ অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, এবং যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া এই ভীষণ অত্যাচার জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করিবে। ইংরাজগণ অত্যন্ত অর্থলোভী; দেশের সমুদয় অর্থ ইহারা শোষণ করিবে। তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার যখন রামনাথ দাস কোনও বাণিজ্যব্যবসায়ীর বাড়ী লুঠ করিতে যাইবে, তখন আমি আমাদের কয়েক জন লাঠিয়াল প্রজা সঙ্গে করিয়া যাইয়া রামনাথকে তাড়াইয়া দিব, এবং নিরাশ্রয় গরীবদিগকে ইহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব।"

রামানন্দ পুত্রের এই কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "বাছা! তুমি পাগল হইয়াছ না কি? কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে?"

প্রেমানন্দ বলিলেন "কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে ইহাতে কোন যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা অন্যায় করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করে। ইহাদিগকে কখনই এইরূপ আচরণ করিতে দিব না।"

রামানন্দ কিছুতেই পুত্রের কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "বাপু! তোমার দ্বারা আমার বিষয় সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম সকলই ছারখার হইবে বলিয়া তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে। কোম্পানির লোকদিগকে স্বয়ং নবাব জাফর আলি খাঁ পর্য্যন্ত ভয় করিয়া চলেন। তুমি এখন সেই কোম্পানির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইবে! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ। আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।"

পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া প্রেমানন্দ একটু সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন "আপনি আমার পিতা—আমার নিকট সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ—আপনি আমার মস্তকে একবার পদাঘাত করিলে, আমি আবার আপনার পদতলে মস্তক অবনত করিয়া রাখিব। কখনও আপনাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলিব না; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আপনার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা লিখিত রহিয়াছে। কোম্পানির লোকেরা যে সকল নিরপরাধা বন্ধু-বান্ধব-বিহীনা রমণীদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে, সেই সকল রমণীর অশ্রুজল হইতে দাবাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া, এ দেশকে ভস্মীভূত করিবে। তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি এবং হাহাকার শব্দ স্বদেশীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছে। যে কোনও ব্যক্তি ইহা-দিগকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, নিশ্চয় তাহাকে এই দেশব্যাপী অত্যাচারের দাবাগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আপনার সদাব্রত, আপনার অতিথিশালা, আপনার দানধর্ম্ম কখনও আপনাকে এই বিনাশের পথ হইতে—এই সমাজব্যাপ্ত দাবাগ্নি হইতে —রক্ষা করিতে পারিবে না। আপনি যাহা আত্মরক্ষার পথ বলিয়া মনে করিতেছেন, সে বাস্তবিক আত্মবিনাশের পথ। আপনি নরপিশাচ রামনাথকে উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহাকে আরও অত্যাচার করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। আমি আবার

বলিতেছি যে, এ অত্যাচারের মূলচ্ছেদ করিতে এখনই চেষ্টা না করিলে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া এই অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে।”

যে সকল মানুষ ঘোর মোহান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, ভোগাসক্তি যাহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কি সৎ কি অসৎ তাহা নির্ব্বাচন করিতে যাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম, হৃদয়ের ভাষা স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায়—বিদ্যুতের আলোকের ন্যায়, সেই সকল লোকের হৃদয়ও ক্ষণকালের নিমিত্ত উদ্বেলিত এবং আলোকিত করিতে পারে। প্রেমানন্দের কথা শুনিয়া রামানন্দ গোস্বামী চমকিয়া উঠিলেন। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সাশ্চর্য্য হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার মনে হইল যে, প্রেমানন্দ যাহা বলিতেছে, তাহা সকলই সত্য। সুতরাং কিছুকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া বলিলেন “বাছা! তুমি তবে কি করিতে চাহ?”

প্রেমানন্দ বলিলেন “আমরা কিছু কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না। কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠীর সাহেব কি বাঙ্গালী গোমস্তা যখন কোন গরিব লোকের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে, তখন আমাদের লোক জন সংগ্রহ করিয়া আমরা সেই গরিবদিগকে ইহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব। দুই তিন ঘটনা উপলক্ষে যদি এই কুঠীর গোমস্তা এবং প্যাদাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি, তবে আর ইহারা অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। বিশেষতঃ আপনি এদেশের প্রধান লোক। আপনি যদি এই পথাবলম্বন করেন, তবে দেশের অন্যান্য লোক আসিয়াও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে। দেশের সমুদয় লোকেরই ইচ্ছা যে, ইহাদের বাণিজ্য-কুঠী গঙ্গায় ডুবাইয়া দেয়।”

পুত্রের বাক্যাবসানে রামানন্দ বলিলেন “তার পর যদি কোম্পানির সাহেবেরা কলিকাতা হইতে সিপাহী আনিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, তখন কি করিবে?”

প্রেমানন্দ বলিলেন “আমার বোধ হয় না যে, এই বাঙ্গালী গোমস্তা দুই চারিটিকে মারিলেই কলিকাতা হইতে সিপাহী আসিয়া যুদ্ধ করিবে; কিন্তু মনে করুন যদি তাহাই হয়, তথাচ এ অত্যাচার নিবারণ না করিলে দেশ শুদ্ধ সকলকেই চিরকাল অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। এখন যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার চলিতেছে, তাহা আজীবন সহ্য করা অপেক্ষা বরং যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই ভাল। এখন পর্য্যন্ত আপনার ঘরের কুলবধূদিগকে অপমান করে নাই বলিয়াই, আপনি এই পথ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মনে করুন, আপনার কুলবধূদিগকে অপমান করিতে উদ্যত হইলে, তখন আপনি যুদ্ধ করিতেও বিরত হইবেন না।"

যুদ্ধের কথা শুনিয়া রামানন্দ বড় ত্রাসিত হইলেন। প্রেমানন্দের পূর্ব্ব-কথা শুনিয়া তাঁহার মন যে একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে ভাব আর স্থায়ী হইল না। রামানন্দ বলিলেন "বাছা! পাগল হইয়াছ? কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ! নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে ইহারা পরাস্ত করিয়াছে। বাছা! তুমি এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। আমার প্রজার উপর তো এখন পর্য্যন্তও কোন অত্যাচার করে নাই। যখন আমার প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিবে, তখন যাহা হয় করিব।"

প্রেমানন্দ তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "আপনার প্রজার উপর কেবল অত্যাচার করিবে কেন, আর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে এই অত্যাচার দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। আজ এই তন্তুবায়, তামাকব্যবসায়ী, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি লোকের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, পাঁচ সাত বৎসর পরে ঠিক এইরূপ অত্যাচার আপনার নিজের ঘরের কুল-বধূদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"

এই বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ইহার পর আরও দুই তিন দিন তাঁহার পিতার সঙ্গে তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু সে বাদানু-বাদের চরম ফল এই হইল যে, রামানন্দ মনে করিতে লাগিলেন, প্রেমানন্দ সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। রামানন্দের আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রেমানন্দকে পাগল বলিয়া অবধারণ করিলেন।

* * *

প্রেমানন্দের স্ত্রী সত্যবতীর বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় বার বৎসর হইয়াছিল। তিনিও স্বামীকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রেমানন্দ মালদহের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে কোথাও যাইয়া কিছুকাল থাকি-বেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার মালদহ পরিত্যাগ করিবার সুযোগ সত্বরই উপস্থিত হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মত্র জমির খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত পূর্ণিয়ায় প্রেরণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সময় জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট

সাহেব পূর্ণিয়ায় বাণিজ্য করিতেন। মূলধন না থাকিলে কি প্রকারে বাণিজ্য চালাইতে হয়, সেই বিষয় বাঙ্গালীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার সদুদ্দেশ্যে বোধ হয় এই তিন মাহাত্মা পূর্ণিয়ায় আদর্শ বাণিজ্যালয় (Model farm) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের গোমস্তা রামচরণ দাস পূর্ণিয়ার লোক-দিগের নিকট হইতে সমুদয় পণ্যদ্রব্যই বাকীতে ক্রয় করিত। কিন্তু ইহ-লোকে আর কেহ এই আদর্শবাণিজ্যালয় হইতে জিনিসের মূল্য পাইত না। মূল্য না পাইলেই বা কি? মৃত্যুর পরও মানবাত্মা অনন্তকাল বিচরণ করিবে। জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেব খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক। হয় তো তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরা টাকা হাতে পাইলেই খরচ করিয়া ফেলে, সুতরাং পণ্য দ্রব্যের মূল্যের সমুদয় টাকা একেবারে পরলোকে বসিয়া দিবেন। সেখানে আর এই বাঙ্গালী বণিক্‌দিগের আপন আপন টাকা অপব্যয় করিবার সুবিধা থাকিবে না। ইঁহারা ইংরাজ লোক। ইঁহাদের উদ্দেশ্য বরাবরই ভাল। এই সদুদ্দেশ্যেই বোধ হয় ইঁহারা জিনিসের মূল্য দিতেন না। তবে বাঙ্গালীর মন কাল। তাঁহাদের এ মহদুদ্দেশ্য কাল বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারিত না।

প্রেমানন্দ পূর্ণিয়ায় পৌঁছিয়াই সেই স্থানের বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী বণিক্‌দিগের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিলেন। ইহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। যে সকল বণিক্ জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের গোমস্তাকে বাকীতে জিনিস দিতে অস্বীকার করে, গোমস্তা তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের মালামাল বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। প্রেমানন্দ পূর্ণিয়ায় পৌঁছিবার দুই দিন পরে পূর্ণিয়ার গবর্ণর সিয়ার আলি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রেমানন্দ যুবক হইলেও তিনি অত্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। গবর্ণর সিয়ার আলি খাঁ বাহাদুর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সিয়ার আলি নিজেও জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের এই বাণিজ্যের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে পূর্ণিয়া হইতে তাঁহার তাড়াইয়া দিবার সাধ্য ছিল না। তাহাতেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছেন।

প্রেমানন্দ সিয়ার আলিকে বলিলেন "আপনি নবাব কাসিম আলির নিকট এই সকল অত্যাচারের বিষয়ে পত্র লিখিলে আমি নিজে সেই পত্রসহ মুঙ্গেরে যাইয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

সিয়ার আলি প্রেমানন্দের কথায় সম্মত হইয়া জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের গোমস্তার সমুদয় অত্যাচারের কথা নবাবের নিকট লিখিলেন। প্রেমানন্দ সিয়ার আলির পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাইয়া নবাব কাসিম আলির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব কাসিম আলি, সিয়ার আলি খাঁর পত্র পাঠ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন "পূর্ণিয়ার সমুদয় প্রজাগণের বাড়ী বাড়ী এই মর্ম্মে পরওয়ানা জারি করিতে হইবে যে, ইংরাজদিগের নিকট বাকীতে তাহারা কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি নবাবের এই পরওয়ানা অমান্য করিয়া কোনও ব্যক্তি ইংরাজদিগের নিকট বাকীতে জিনিস বিক্রয় করে, তবে বিক্রীত জিনিস নবাব সরকারে ক্রোক হইবে, এবং বিক্রেতাকে এতদ্ভিন্ন আরও জরিমানা দিতে হইবে।"

পূর্ণিয়াতে এই সময় জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট ভিন্ন অপর কোনও ইংরাজ বণিক্ ছিলেন না। সুতরাং বোল্ট সাহেব এই পরওয়ানা জারির কথা শুনিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, সিয়ার আলিকে ধমকাইয়া এক পত্র * লিখিলেন। গবর্ণর বেরেলষ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে বোল্ট সাহেব এই ঘটনার ১২ বৎসর পরে যখন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন বোল্ট সাহেবের এই পত্র লইয়া বড় আন্দোলন হইয়াছিল। আর মীর কাসিম এইরূপ পরওয়ানা জারি করিয়াছিলেন বলিয়াই, জনষ্টোন এবং হে সাহেব ইংরাজদিগের সহিত মীর কাসিমের যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই উপন্যাসের কোনও সংস্রব নাই। সুতরাং প্রেমানন্দ ইহার পর যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই কেবল এই স্থানে উল্লেখ করিব।

এই পরওয়ানা জারির পর জনষ্টোন, হে এবং বোল্ট সাহেবের আদর্শ বাণিজ্যালয় পূর্ণিয়া হইতে উঠিয়া গেল। প্রেমানন্দ দেখিলেন যে, চেষ্টা করিলে অনেক অত্যাচার নিবারণ করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি মালদহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই রামনাথ দাসের বিরুদ্ধে গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি মালদহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র মীর কাসিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই সময় কলিকাতা গেলে কোন উপকার

---

* Vide note (Io) in the appendix.

নাই। প্রেমানন্দ অগত্যা প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মালদহের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন এখনও তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার স্ত্রী সত্যবতীও তাঁহাকে সময় সময় একটু তিরস্কার করিতেন।

* * * * *

মীর কাসিমের সিংহাসনচ্যুতির পর পুনর্ব্বার মীর জাফর সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার আবার শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। বঙ্গের বাণিজ্যব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকের যন্ত্রণার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মালদহের বাণিজ্য-কুঠীর অধ্যক্ষ গ্রে সাহেব নানাবিধ কুকার্য্যের নিমিত্ত কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের তীব্র দৃষ্টিতে পড়িয়া সত্বর সত্বর বিলাতে পলায়ন করিলেন। গ্রে সাহেব বঙ্কুলাঙ্গার রামনাথের একজন প্রধান মুরুব্বি ছিলেন। সুতরাং গ্রে সাহেব বিলাত চলিয়া গেলে পর ১৭৬৫ সালে প্রেমানন্দ কলিকাতা যাইয়া রামনাথের বিরুদ্ধে লর্ড ক্লাইবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এই সকল অভিযোগের বিচার হইবার পূর্ব্বেই লর্ড ক্লাইব বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বেরেলষ্ট সাহেব বঙ্গের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। বেরেলষ্ট সাহেবের সঙ্গে রামনাথের পূর্ব্ব হইতে মনোবাদ ছিল। সুতরাং রামনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, বেরেলষ্ট সাহেব তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের জেলে প্রেরণ করিলেন।* রামনাথ বিবিধ অত্যাচার এবং অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া যে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই তাহাকে উৎকোচস্বরূপ নবকৃষ্ণ মুন্সীকে দিতে হইল। এই প্রকারে পাপাত্মা রামনাথ অত্যল্প কালের মধ্যেই ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইল।

প্রেমানন্দ মনে করিলেন যে, মালদহ এবং পূর্ণিয়ার অত্যাচার এখন ক্রমেই হ্রাস হইবে। কিন্তু তাঁহার সে বৃথা আশা। এক গ্রে সাহেব বিলাত চলিয়া গেলে, আবার দশ গ্রে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হয়। এক রামনাথ মরিয়া গেলে, কিংবা জেলে গেলে, বঙ্গমাতা আবার শত শত রামনাথ দিনু দিন প্রসব করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বৃদ্ধি

* Vide note (II) in the appendix.

হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কোম্পানির বঙ্গ ও বেহারের দেওয়ানি প্রাপ্তির পর ইংরাজদের ক্ষমতা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তখন তাঁহাদের অত্যাচারের স্রোত আর কে অবরোধ করিবে!

প্রেমানন্দ কলিকাতা হইতে মালদহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্যূন চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার পিতার মালদহস্থ ভবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকলে পাগল বলিয়া মনে করিতেন। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার স্ত্রী সত্যবতী দেবীও তাঁহার কার্য্যকলাপ অনুমোদন করিতেন না। প্রেমানন্দ মনে করিলেন যে, অন্ততঃ আপন স্ত্রীকে নিজের মতে আনিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি ১৭৬৮ সাল হইতে ১৭৭৪ সাল পর্য্যন্ত মালদহে অবস্থান-কালে স্ত্রীর সঙ্গে সময় সময় অনেক শাস্ত্রালাপ করিতেন। সত্যবতী এই সময়ই স্বামীর নিকট অনেক শাস্ত্রের কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

* * * *

১৭৭০ সালে বঙ্গদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। পূর্ণিয়ায় সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। রামানন্দ গোস্বামী অত্যন্ত প্রজাবৎসল ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা এবং জামাতাকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ণিয়াতে চলিয়া গেলেন। পূর্ণিয়ায় তাঁহার জমিদারী কাছারিতে পরিবারের বাসোপযোগী গৃহাদি ছিল। তিনি আপন জমিদারী কাছারীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের যে কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা সমুদয়ই এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্যয় করিলেন। কখনও কখনও অর্থের অনটন হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সাহায্য করিতেন। কিন্তু এ বৎসর শিষ্যগণেরও সাহায্য করিবার বড় সুবিধা ছিল না।

* * * * *

এই দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রাজা দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমুদয় পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারও দেবীসিংহের হস্তেই ছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন কোন জমিদার প্রজার নিকট হইতে এক পয়সা করও আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না, বরং প্রজাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক জমিদারকে আপন আপন পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে হইল। কিন্তু দেবীসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত জমিদার তালুকদারদিগকে রাজস্ব

আদায়ের কাছারিতে আনিয়া কয়েদ রাখিলেন। জমিদারদিগের হাতে এক-বারে টাকা ছিল না। শত প্রহার করিয়াও দেবীসিংহ তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি জমিদার তালুকদারদিগের পরিবারস্থ কুল-কামিনীদিগকে পর্য্যন্ত ধৃত করিয়া কাছারিতে আনিবার হুকুম দিলেন। দেবীসিংহের প্যাদা ও বরকন্দাজ সেই কুল-কামিনী-দিগের অঙ্গের স্বর্ণাভরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিতে লাগিল। কোনও কোনও জমিদার তালুকদারকে অপমান করিবার নিমিত্ত তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় কাছারিতে দাঁড় করাইয়া রাখিতে লাগিল! যে সকল হিন্দুকুল-কামিনী কখনও চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দর্শন করেন নাই, বঙ্গকুলাঙ্গার দেবীসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহাদিগের উপর ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল।

রামানন্দ গোস্বামীর সমুদয় জমিই নিষ্কর ব্রহ্মত্র ছিল। কিন্তু দেবীসিংহ রামানন্দের নিকটও খাজনা তলব করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর হেষ্টিংস কাহারও নিষ্কর জমি ভোগ করিবার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রামানন্দ দেবীসিংহের ভয়ে রাজসাহীর রাণী ভবানীর নিকট হইতে ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া গত তিন বৎসরের রাজস্ব আদায় দিলেন। কিন্তু ১৭৭১ সনে আবার দেবীসিংহ রামানন্দের নিকট এক সনের রাজস্ব দাবী করিলেন। এখন রামানন্দের আর একটি টাকা দিবারও সাধ্য ছিল না। কয়েক দিন পর দেবীসিংহ রামানন্দকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী কাছারিতে প্যাদা ও বরকন্দাজ প্রেরণ করিলেন। রামানন্দ সপরিবারে এখনও তাঁহার জমিদারী কাছারিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দেবীসিংহের প্যাদা তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে ও ত্রাসে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তখন প্রেমানন্দ তাঁহাকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আপনার কোনও ভয় নাই, আমিই হাজির হইতেছি। আপনি আমার নিমিত্ত কোনও চিন্তা করিবেন না। কিন্তু এখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, আপনি শীঘ্র শীঘ্র আপ-নার পুত্রবধূ এবং কন্যাকে সঙ্গে করিয়া রঙ্গপুরে কোনও শিষ্যের বাড়ী যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন।"

পিতাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া, প্রেমানন্দ নিজে বাহির বাড়ী আসি-লেন। তাঁহার বাহির বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই দেবীসিংহের লোকেরা

তাঁহার ভগ্নীপতিকে ধৃত করিয়াছিল। প্রেমানন্দ দেবীসিংহের বরকন্দাজদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমার নাম প্রেমানন্দ গোস্বামী। আমি নিজেই হাজির হইতেছি। এখনই কাছারীতে যাইয়া দেবীসিংহের যাহা কিছু পাওনা, তাহা পরিশোধ করিব। কিন্তু তোমরা আমার বৃদ্ধ পিতাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই আমার হাতে প্রাণ হারাইবে। একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি।"

এই বলিয়া প্রেমানন্দ গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরী বস্ত্রাবৃত করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা দেবীসিংহের প্রাণ বিনাশ করিয়া অত্যাচারের হস্ত হইতে বঙ্গদেশকে নির্ম্মুক্ত করিবেন।

* * * * *

দেবীসিংহের প্যাদা এবং বরকন্দাজ প্রেমানন্দ এবং তাঁহার ভগ্নীপতি রাধাকৃষ্ণ অধিকারীকে মালকাছারীতে রাজা দেবীসিংহের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল।

দেবীসিংহ তাকিয়া ঠেস দিয়া একখান তক্তপোষের উপর গদি পাতিয়া বসিয়া আছেন। আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। তহসিল কাছারীর আমলাগণ নীচে বিছানার উপর তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া হিসাব পত্র প্রস্তুত করিতেছে। বাহিরে গৃহের সম্মুখে ত্রিশ বত্রিশ জন জমিদারকে দেবীসিংহের সিপাহীগণ অত্যন্ত প্রহার করিতেছে। কাহারও হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়াছে। কোন কোন জমিদারের আর উত্থানশক্তি নাই, ভূমিতলে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন; কিন্তু দেবীসিংহ এখনও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে হুকুম দিতেছেন। আর দুই এক বার প্রহার করিলে তাঁহাদের এ সংসারের সকল যন্ত্রণা নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু গৃহের মধ্যে পাপাত্মা দেবীসিংহের ঠিক সম্মুখে, সিপাহীগণ কি ভীষণ অত্যাচারই করিতেছে! মানুষ কি কখনও এইরূপ অত্যাচার করিতে পারে? জমিদারের ঘরের সাত আট জন ভদ্র মহিলাকে সিপাহীগণ বিবস্ত্রাবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া অপমান করিতেছে। রমণীগণ হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়াছেন। চক্ষের জলে তাঁহাদের অনাবৃত বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে ইঁহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন স্ত্রীলোক লজ্জায় একেবারে অচৈতন্য হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন।

*   *   *   *   *

এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিবামাত্র প্রেমানন্দ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি বাড়ী হইতে মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন যে, রাজস্বের টাকা এবং নজর প্রদান করিবার ছলনায় দেবীসিংহের নিকটে যাইয়া সঙ্গের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তাঁহার বক্ষে বসাইয়া দিবেন। কিন্তু রমণীগণের এই দুরবস্থা দেখিয়া প্রেমানন্দ আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। তিনি শরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক "নরপিশাচ!—অবলা রমণীদিগের উপর এই অত্যাচার—এখনই তোরে খুন করিব" এইরূপ চীৎকার করিয়া লাফ দিয়া দেবীসিংহের নিকট যাইবামাত্র, পশ্চাৎ ও সম্মুখ হইতে চারি পাঁচ জন লোক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন তাঁহার আর হস্ত উঠাইবার সাধ্য রহিল না। কিন্তু তখনও দেবীসিংহকে গালিবর্ষণ করিতেছিলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"নির্লজ্জ নরাধম! যত দিনে পারি আমি নিশ্চয়ই তোর প্রাণবিনাশ করিব—এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র তোর জন্যই আনিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া প্রেমানন্দ বস্ত্রাবৃত ছুরিকা বাহির করিলেন। দেবীসিংহ প্রেমানন্দের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরী দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দকে স্বতন্ত্র কারাগারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সিপাহীগণকে ইশারা করিলেন।

সে ইশারার অর্থ—এখনই ইহার প্রাণবিনাশ কর। অন্যান্য কয়েদিকে সিপাহীগণ সায়ংকালে সাধারণ কারাগারে রাখিল।

*   *   *   *   *

ইহার পরদিন প্রাতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন কয়েদি, দেবীসিংহের লোকের প্রহারে মারয়া গেল। লোকমুখে রামানন্দ গোস্বামী শুনিলেন যে, দেবীসিংহের লোকের প্রহারে তাঁহার পুত্র প্রেমানন্দ এবং জামাতা রাধাকৃষ্ণ অধিকারী মরিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহাদের মৃত শব আনিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাধাকৃষ্ণ অধিকারীর মৃত দেহ পাওয়া গেল। কিন্তু প্রেমানন্দের মৃতদেহ আর বাছিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। অনেকানেক লোকের মৃতদেহই প্রহারে অত্যন্ত বিকটাকৃতি হইয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল যে, প্রেমানন্দকে অধিক প্রহার করিয়াছিল, তাঁহাতেই তাহার মৃতদেহ এখন চিনিয়া বাহির করিবার সাধ্য নাই।

প্রেমানন্দের ভগ্নী প্রভাবতী দেবী স্বীয় স্বামী সহ অনুমৃতা হইলেন। রামানন্দ পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে কৃষ্ণগঞ্জের মধ্য দিয়া বরাবর রঙ্গপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবীসিংহ।

রামানন্দ গোস্বামী স্বীয় পুত্রবধূ, একজন বৃদ্ধা দাসী ও তিন চারি জন বিশ্বস্ত প্রজা সঙ্গে করিয়া, অতি কষ্টে রঙ্গপুর আসিয়া পৌছিলেন। রঙ্গপুরের অনেকানেক জমিদারই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি কোনও এক শিষ্যের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিষ্য পরম সমাদরে তাঁহাকে আপন বাড়ীতে রাখিয়া সর্ব্বদা যত্নের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র-কন্যার শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

এদিকে দেবীসিংহের অত্যাচারে পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল। ১৭৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গের গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস পরিদর্শন কমিটীর (Committee of Circuit) অধ্যক্ষস্বরূপ স্বয়ং পূর্ণিয়ায় আসিয়া দেবীসিংহের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিলেন। পরিদর্শনকালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। তিনি সঙ্গে না থাকিলে উৎকোচের বন্দোবস্ত চলে না বলিয়াই, হেষ্টিংস তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যখন মুর্শিদাবাদে কাননগুর কার্য্য করিতেন, তখন হইতেই দেবীসিংহের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা আরম্ভ হয়। সুতরাং এখন বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ পাইয়া দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত বারংবার তিনি হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দেবীসিংহের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার লোক অনেকানেক অভিযোগ উপস্থিত

করিয়াছিল। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস তজ্জন্য তাঁহাকে কখনও পদচ্যুত করিতেন না। কেবল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুরোধেই হেষ্টিংস দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিলেন।

দেবীসিংহের ইজারা লইবার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার বার্ষিক রাজস্ব ষোল লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু দেবীসিংহের অত্যাচারে পূর্ণিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী স্থানান্তরে চলিয়া গেল; অনেকানেক লোক মরিয়া গেল। তাহাতে পূর্ণিয়ার রাজস্ব এত হ্রাস হইয়া পড়িল যে, পরে কয়েক বৎসর যাবৎ বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকার অধিক আদায় হইত না।

দেবীসিংহ দেখিলেন যে, হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শানুসারেই সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এখন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। যে জন্য দেবীসিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। এখানে কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, দেবীসিংহ গঙ্গাগোবিন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আর যে রমণীকে লইয়া ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয়, দেবীসিংহ তাহাকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক ধৃত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং দেবীসিংহের মধ্যে পুনর্ব্বার বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবেন বলিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই গঙ্গাগোবিন্দের অনুরোধে হেষ্টিংস দেবীসিংহকে আবার মুর্শিদাবাদের প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন।

মুর্শিদাবাদের প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের সাহেবেরা সুরাপান প্রভৃতি বিবিধ ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না—এবং বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। এই তরুণবয়স্ক ইংরাজ-দিগের কুপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত দেবীসিংহ দুই একটী দেশীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া ইঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেবীসিংহ ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই দশ বারটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া আপন গৃহে রাখিতেন, *

---

* Vide note (12) in the appendix.

এবং এই সকল হতভাগিনী রমণীকে এক একটী নূতন নূতন নাম প্রদান করিয়া সাহেবদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। কোনও কোনও স্ত্রীলোককে দেল্‌খোষ্ বিবি নামে অভিহিত করিতেন। কাহারও নাম রংবাহার রাখিতেন। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে কখনও কখনও তপ্তকাঞ্চন, রসমঞ্জরী, রসের ডালি, টাট্‌কা মধু ইত্যাদি কুৎসিত-ভাব-উত্তেজক নামে অভিহিত করিতেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের সাহেবেরা সেই সকল তপ্তকাঞ্চন এবং দেল্‌খোষ্ বিবিদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করিতেন। এ দিকে দেবীসিংহ কৌন্সিলের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া দেশ উৎসন্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উৎকোচ বিভাগ সম্বন্ধে দেবীসিংহের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হইল। তাঁহারা দেবীসিংহকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলেন।

দেবীসিংহ অনন্যোপায় হইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাগত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেবীসিংহকে যে প্রকারে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া দেবীসিংহ স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে রমণীকে ধৃত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানে দিগ্বিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

দেবীসিংহের গুপ্তচরেরা রঙ্গপুর যাইয়া শুনিতে পাইল যে, একজন

* * *

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী যুবতীকে সঙ্গে করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক রঙ্গপুরের কোনও এক জমিদারের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছেন। পলায়ন পূর্ব্বক একজন যুবতী এখানে আশ্রয় লইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহারা যে ব্রাহ্মণকন্যার অনুসন্ধান করিতেছে, তিনিই এই যুবতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া বল পূর্ব্বক সেই রমণীকে ধৃত করিয়া দেবীসিংহের নিকট লইয়া যাইবার সুযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু এই রমণী রামানন্দ গোস্বামীর পুত্রবধূ। রামানন্দ দেবীসিংহের গুপ্তচরদিগের এই সকল দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রঙ্গপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া দিনাজপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুত্রবধূর নিকট দেবীসিংহের এই সকল দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

তিনি মনে মনে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ এই সকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা করিবে।

১৭৭৮ সালে রামানন্দ রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া এইপ্রকার জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস এই ভাবেই কালযাপন করিলেন। পরে দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাণনগরের জঙ্গলের উত্তর প্রান্তে কোনও একটী জঙ্গল-পরিবেষ্টিত স্থানে তিনখানি পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া গত তিন বৎসর যাবৎ তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহার্থ ভিক্ষা ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং বৈরাগীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। প্রায় তিন বৎসর যাবৎ এখানে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের রাজার মৃত্যুর পর ১৭৮১ সালে দেবীসিংহ রঙ্গপুর এবং দিনাজপুরের কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে আসিলেন। তখন দেবীসিংহের বরকন্দাজগণ পলাতক প্রজাদিগের অনুসন্ধানে দিনাজপুরের উত্তর বিভাগে আসিয়া শুনিতে পাইল যে, রামানন্দ গোস্বামী নামে একজন ভূম্যধিকারী ইহার নিকটবর্ত্তী কোনও জঙ্গলে বাস করিতেছেন। তাহারা রামানন্দকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে যেরূপে রামানন্দ নিজেই ধরা পড়িলেন, এবং তাঁহার পুত্রবধূ একজন বৃদ্ধা দাসী, আর দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়েই উল্লিখিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

কলিকাতা রাজস্ব-কমিটী সংস্থাপন।

দেবীসিংহ যেরূপে দিনাজপুর এবং রঙ্গপুরের কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ না করিলে পাঠকগণ উপন্যাসের লিখিত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংস পাঁচসনা বন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলে পরই, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, পাটনা, দিনাজপুর এবং ঢাকা এই ছয় প্রদেশের রাজস্বসংক্রান্তি প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল কলিকাতায় একটী রাজস্ব-কমিটী সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের মধ্যে তিনি এবং বারওয়েল সাহেব এক পক্ষে ছিলেন। অপর দুই জন মেম্বর তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন। কৌন্সিলে বিপক্ষদল প্রায়ই তাঁহার কোনও প্রস্তাব অনুমোদন করিতেন না। আবার কোর্ট অব্ ডিরেক্টরও তাঁহাদের ১৭৭৭ সালের ৪ঠা জুলাইএর পত্রে রাজস্ব বন্দোবস্ত সংক্রান্ত হেষ্টিংসের অন্য অনেকানেক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এবং হেষ্টিংস দিন দিন নূতন নিয়ম প্রচার করিতে চাহেন বলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কারও করিয়াছিলেন। * সুতরাং হেষ্টিংস সাহেব আপাততঃ কিছুকাল নির্ব্বাক্ রহিলেন।

কিন্তু যখন বেহারের কল্যাণসিংহ বেহার প্রদেশের সমুদয় জমি বন্দোবস্ত লইবার প্রার্থী হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দ্বারা হেষ্টিংসকে চারিলক্ষ টাকা উৎকোচ দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং তৎপরে আবার যখন ১৭৮০ সালের জুলাই মাসে দিনাজপুরের রাজার মৃত্যু হইল, এবং দিনাজপুর রাজ-পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইতে উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব আসিতে লাগিল, তখন আর হেষ্টিংস লোভ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নিজের হাতে আনিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু কি উপায়ে এবং কি প্রণালীতে বন্দোবস্তের ভার নিজের হাতে আনিলে ভবিষ্যতে তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশ না পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিয়া গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের হাতে (অর্থাৎ তাঁহার নিজের কৌন্সিলের হাতে) সকল ক্ষমতা রাখিলেও অনেক বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, তাঁহার বিপক্ষদল তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে না পারিলেও, কৌন্সিলের কার্য্যবিবরণ পুস্তকে তাঁহাদের বিরুদ্ধ মত লিপিবদ্ধ থাকিলে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তদ্দৃষ্টে তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন। যদিও

---

* Vide note (4) in the appendix.

তিনি কৌন্সিলের সভাপতি ছিলেন বলিয়া সমান সমান মতভেদ স্থলে তাঁহার মতানুসারেই কার্য্য হইত, তথাচ কোর্ট অব্ ডিরেক্টর ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার বিপক্ষদলের লিখিত মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁহার দুরভিসন্ধি সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাণী এবং রাজসাহীর রাণী ভবানীর প্রতি তিনি এবং বারওয়েল সাহেব যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাহা তাঁহার বিপক্ষ-দলের মন্তব্য পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। * হেষ্টিংস এই সকল বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া মনে মনে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রবি-ন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিবেন; কিন্তু বন্দোবস্তের ভার তাঁহার নিজের হাতে কিংবা গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের হাতে রাখিবেন না। সমুদয় বন্দোবস্তের ভার যাহাতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে থাকে, তাহারই কোনও উপায় অবলম্বন করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ পূর্ব্বসংস্থাপিত ছয়টী প্রবি-ন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল কলিকাতায় একটী কমিটী অব্ রেবিনিউ (Committee of Revenue) সংস্থাপন করিলেন। কয়েকটী তরুণবয়স্ক ইংরাজকে এই কমিটী অব্ রেবিনিউর মেম্বর মকরর করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে কমিটীর দেওয়ানের পদ প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সমুদয় ক্ষমতা প্রকারান্তরে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কমিটী অব্ রেভিনিউর সেই তরুণবয়স্ক ইংরাজ মেম্বরগণ এ দেশের আচার ব্যবহার কিছুই জানিতেন না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহই সমুদয় কার্য্য আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করিতেন। কমিটীর মেম্বরগণের উপর কেবল দস্তখতের ভার রহিল।

১৭৭১ সালে এই কমিটী অব্ রেবিনিউ সংস্থাপিত হইল। এই সময় হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমন পর্য্যন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একপ্রকার গবর্ণর জেনেরল হইলেন। দেশের সমুদয় জমিদার ও তালুকদার গঙ্গাগোবিন্দের করতলস্থ হইয়া পড়িলেন।

* * *

১৭৮০ সালে দিনাজপুরের রাজার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার নাবালক পোষ্য পুত্রকেই তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার

---

* Vide note (7) in the appendix.

করিলেন এবং নাবালকের নিকট হইতে চারি লক্ষ টাকা সেলামী গ্রহণ করিয়া তাঁহার পৈতৃক জমিদারী তাঁহার সহিতই বন্দোবস্ত করিলেন।

হেষ্টিংস এবং গঙ্গাগোবিন্দ নাবালক রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব এবং দেবীসিংহের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই উপলক্ষেই দেবী-সিংহ গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বোধ হয় এই নাবালকের সমুদয় জমিদারী গঙ্গাগোবিন্দ নিজে আত্মসাৎ করিবেন বলিয়াই তিনি দেবীসিংহের ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার সমর্পণ করিলেন। আর হেষ্টিংসের প্রাপ্য উৎকোচ সহজে আদায় হইতে পারে, সেই অভিপ্রায় সাধনার্থ গুড্‌ল্যাডের ন্যায় উপযুক্ত লোককে অসীম ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক রঙ্গপুর এবং দিনাজপুরের কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

গুড্‌ল্যাড্‌ এবং দেবীসিংহ উভয়েই তুল্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। গুড্‌-ল্যাড্‌কে বিলাতী দেবীসিংহ, এবং দেবীসিংহকে দেশীয় গুড্‌ল্যাড্‌ বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

এই দুই মহাত্মা দিনাজপুরের রাজার ষ্টেটের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করিলেন, এবং সেই সকল বৃদ্ধ কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের কয়েক জন যুবককে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে তাঁহারা ষ্টেটের ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত দিনাজপুরের রাণী মৃত রাজার সময় হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ব্রতাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসে মাসে যে টাকা পাইতেন, তাহা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

ষ্টেটের টাকা কোন প্রকারে অপব্যয় না হয় তজ্জন্য, রাণীর পিতা কিংবা সহোদর ভ্রাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহাদের আহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিন আটটি পয়সার অধিক দেওয়া হইত না। কিন্তু ষ্টেটের ম্যানে-জার গুড্‌ল্যাডের কোনও মেটে ফিরিঙ্গী বন্ধু রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলে, রাজার সম্মান রক্ষার্থ, এবং ঈদৃশ অভ্যাগত লোকের প্রতি সমাদর প্রদর্শনার্থ, ষ্টেট হইতে ব্র্যাণ্ডি ও শ্যাম্পেনে দিন ত্রিশ চল্লিশ টাকার অধিক ব্যয় হইত। * এই এই প্রকার সুনিয়মে গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব এবং দেবীসিংহ দিনাজপুরের রাজার ষ্টেট রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে দেবীসিংহ দিনাজপুরের রাজার সমুদয় জমিদারী এবং

* Vide note (13) in the appendix.

তৎসঙ্গে রঙ্গপুর এবং এদ্রাকপুরের সমুদয় জমি একজন মুসলমানের বেনামীতে নিজেই ইজারা লইলেন। এই বন্দোবস্ত মন্দ হইল না। কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের নিজের দেওয়ানই তাঁহার এলেকার অন্তর্গত দুইটি জিলার সমুদয় জমির ইজারাদার হইলেন। গুড্‌ল্যাড্ সাহেব এ সকল দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক। বাইবেলে স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে, (Resist no evil) অত্যাচারের অবরোধ করিও না। সুতরাং গুড্‌ল্যাড্ কখনও দেবীসিংহের কোনও অত্যাচার কিংবা অন্যায় ব্যবহারের অবরোধ করিতেন না। আবার দেবীসিংহের যে একেবারে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, তাহা কখনও বলা যাইতে পারে না। একদিকে তিনি যেমন নিজের উপকারার্থে দিনাজপুরের সমুদয় জমি ইজারা লইলেন, পক্ষান্তরে আবার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহেরও বিশেষ উপকার সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনাজপুরের নাবালক রাজাকে বাধ্য করিয়া জমিদারীর কতক অংশ গঙ্গাগোবিন্দকে কবলা করিয়া দেওয়াইলেন। কেনই বা এরূপ করিবেন না ? গঙ্গাগোবিন্দের অনুগ্রহেই তিনি গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের প্রসাদেই তিনি দিনাজপুরের রাজার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে তিনি নাবালক রাজার জমিদারী ইজারা লইলেন। এখনও তিনি গঙ্গাগোবিন্দের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দিনাজপুরের রাজার জমিদারীর কতকাংশ ছলে, বলে, কৌশলে গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়াইলেন।

এই প্রকারে ১৭৮১ সালে দেবীসিংহ রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং এদ্রাকপুর ইজারা লইয়াই, এই তিন প্রদেশীয় সমুদয় জমিদারদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা তলপ করিলেন। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে দেশের এক-তৃতীয়াংশ কৃষকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৭০ সাল হইতেই জমিদারগণের আয় একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই তাঁহাদের দখলের অধিকাংশ জমি এ যাবৎ পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর আবার পাঁচসনা বন্দোবস্তের সময় যে সকল জমিদার পৈতৃক জমিদারী পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তখনই ওয়ারেন হেষ্টিংসের দৌরাত্ম্যে অনেক বৃদ্ধি জমায় আপন আপন জমিদারী বন্দোবস্ত লইতে হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় জমিদারদিগের পুনর্ব্বার বৃদ্ধি জমা প্রদান করিবার কোনও উপায়ই ছিল না। জমিদারগণ বৃদ্ধি জমায় কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলে,

দেবীসিংহ তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া কয়েদে রাখিলেন। জমিদারেরা তখন আপন আপন জমিদারী ইস্তফা দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বাকী খাজনা পরিষ্কার করিয়া না দিলে কেহ জমিদারী ইস্তফা দিয়াও দেবীসিংহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সুতরাং জমিদারগণ আপাততঃ দেবীসিংহের কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধি জমার কবুলতি দিলেন। কবুলতি প্রদানের কয়েক দিবস পরেই দেবীসিংহের অধীন লোকেরা খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের নিকট নানা প্রকারের আবওয়াব এবং কোম্পানির টাকার হিসাবে নারায়ণী টাকার উপর বাঁটা ইত্যাদি তলপ করিল। নিরাশ্রয় জমিদারগণ এত টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দেবীসিংহের লোকেরা জমিদার, তালুকদার এবং কৃষকদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল।

দশ বৎসর পূর্ব্বে দেবীসিংহ পূর্ণিয়ায় যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে অত্যাচার, সে নিষ্ঠুরতা, এ অত্যাচারের নিকট কিছুই নহে। দেশীয় অনেক কৃষক আপন স্ত্রী-পুত্র সহ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। দেবীসিংহ মনে করিলেন, এই সকল কৃষক আপন আপন ক্ষেত্রের ধান্য সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তখন এই সকল পলায়িত কৃষকের অনুসন্ধানে জঙ্গলে জঙ্গলে বরকন্দাজ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরিত বরকন্দাজগণ মধ্যে যাহারা দিনাজপুরের উত্তর প্রদেশে গিয়াছিল, তাহাদিগের কর্ত্তৃকই রামানন্দ গোস্বামী ধৃত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

কারাগার।

দেবীসিংহের বরকন্দাজগণ রামানন্দ গোস্বামীকে ধৃত করিয়াই, কৃষকগণ কোন জঙ্গলের মধ্যে শস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামানন্দ তাহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বরকন্দাজগণ তাহাদের প্রশ্নের কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক প্রহারের পরও যখন রামানন্দ কোনও কথা বলিলেন না, তখন তাহারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দেবীসিংহের তহসিল-কাছারিতে লইয়া চলিল।

রামানন্দ গোস্বামী অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে দেবীসিংহ এই বরকন্দাজগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। পলায়িত রায়তগণ কোন জঙ্গলের মধ্যে আপন আপন ক্ষেত্রের ধান্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, সেই বিষয়ের অনুসন্ধানেই এই সকল বরকন্দাজ দিনাজপুরের উত্তর প্রান্তে আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া ইহারা শুনিতে পাইল যে, রামানন্দ গোস্বামী ছদ্মবেশে প্রাণনগরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। রামানন্দের দিনাজপুরেও অনেকানেক নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি ছিল। কিন্তু হেষ্টিংসের দৌরাত্ম্যে দেশের সমুদয় নিষ্কর জমির উপরেই কর ধার্য্য হইয়াছে। এখন আর দেশে কেহ নিষ্কর জমি ভোগ করিতে পারেন না। দেবীসিংহের সেরেস্তায় রামানন্দের নামে অনেক খাজনা বাকী লিখিত রহিয়াছে। বরকন্দাজগণ রামানন্দের নাম শ্রবণমাত্রেই তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা মনে করিল যে, খাজনা না দিবার উদ্দেশ্যে রামানন্দ ছদ্মবেশে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিয়া রহিয়াছেন।

বরকন্দাজগণ রামানন্দকে ধরিয়া দেবীসিংহের কারাগারে আনিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিবামাত্র সেই স্থানের ভীষণ অত্যাচার দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

* * * * *

এ কারাগার কি ভয়ঙ্কর স্থান! কি ভীষণ অত্যাচারই এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছিল! মানুষ কি মানুষের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারে? এ কারাগারের উৎপীড়নকারীদিগের হৃদয় কি পাষাণমণ্ডিত? কারারুদ্ধ হতভাগ্যগণ যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, বোধ হয় নরকেও পাপীকে এইরূপ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ক্রন্দন এবং আর্ত্তনাদের ভীষণ রবে সমুদয় কারাগার পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিক্ হইতেই "মলেম মলেম", "বাবা রে", "প্রাণ গেল রে" এই চীৎকারের শব্দ শুনা যাইতেছিল। কোনও স্থানে সিপাহীগণ এক একটি কয়েদির হস্তাঙ্গুলি একত্রে

কসিয়া বান্ধিয়া তন্মধ্যে মুদ্গর দ্বারা লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কোথাও তিন চারি জন সম্ভ্রান্ত জমিদারসন্তানকে রজ্জু দ্বারা একত্রে বন্ধন করিয়া অবিশ্রান্ত তাঁহাদের পৃষ্ঠের উপর বিছুটির দ্বারা আঘাত করিতেছে। আঘাতে আঘাতে ইঁহাদের পৃষ্ঠের চর্ম্ম একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই চর্ম্মশূন্য পৃষ্ঠের উপর আবার কিছুকাল পরে কণ্টকপূর্ণ বেলের ডালের আঘাত করিতেছে।

দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুখ-শয্যায় যে সকল জমিদারসন্তানের নিদ্রা হয় না, আজ তাঁহাদের পৃষ্ঠে শত শত কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; আজ তপ্ত লৌহদণ্ডের প্রহারে তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে।

এই সকল অত্যাচার-নিপীড়িত জমিদার তালুকদারের যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা পূর্ব্বেই ক্রোক এবং নীলাম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের দেয় খাজনা আদায় হয় নাই। দেবার্চ্চনা, দানধর্ম্ম এবং অন্যান্য পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই সকল জমিদার তালুকদারের যে নিষ্কর খামার জমি, কিংবা নিজ জোত ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেবীসিংহ নীলাম করাইয়া অত্যল্প মূল্যে নিজে খরিদ করিয়াছেন। দেশের একটি লোকেরও জমি ক্রয় করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং কোনও কোনও জমিদারের হাজার টাকা মূল্যের খামার জমি দেবীসিংহ নিজে বেনামিতে এক টাকা মূল্যে ক্রয় করিতেছেন।

কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব দেবীসিংহের এই সকল অত্যাচার এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার কিছুই শুনিতে পাইলেন না। বোধ হয় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। নহিলে এই দেশব্যাপী অত্যাচারের বিন্দু বিসর্গও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না কেন?

দেবীসিংহের কারাগারে জমিদার তালুকদার ভিন্ন সহস্র সহস্র প্রজাও রুদ্ধাবস্থায় রহিয়াছে। প্রহারে এই সকল কৃষকের মধ্যে কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, কেহ কেহ একেবারে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অসংখ্য কৃষক প্রহারের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে, "সংসারে পরমেশ্বর নাই" "সংসারে পরমেশ্বর নাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

দেবীসিংহের বরকন্দাজগণ এই নিরাশ্রয় হতভাগ্য কৃষকদিগের যে হস্ত ভগ্ন করিতেছে, সে হস্ত কি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিয়াছে? এই দুর্ব্বল

হস্তের পরিশ্রমজাত ফল সমুদয় বঙ্গবাসীকে অন্ন প্রদান করিতেছে। এই দুর্ব্বল হাতের পরিশ্রমজাত ফলের বিনিময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীন দেশ হইতে বিবিধ সুখাদ্য আহরণ করিতেছেন। ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ পর্য্যন্ত এই হাতের পরিশ্রমজাত ফল সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতেছেন। এই নিরাশ্রয় কৃষকগণ অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণ ফল লাভ করিতেছে, তাহার শতাংশের একাংশও তাহারা নিজে সম্ভোগ করে না।

তবে আবার ইহাদের উপর এ ঘোর অত্যাচার কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কি শুনিতে পাই? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিক অর্থের প্রয়োজন। কৃষককে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানার্থ অতি উচ্চ বেতনে লর্ড বিশপ নিযুক্ত করিতে হয়, রাজস্ব আদায় নিমিত্ত গুড্‌ল্যাডের ন্যায় উপযুক্ত কলেক্টর এবং দেবীসিংহের ন্যায় উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়, শান্তিরক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করিতে হয়, কৃষক তাহার যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া ইহার ব্যয় বহন না করিলে দেশ-শাসনের ব্যয় কিরূপে চলিবে? কৃষক কেবল অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিবে; কিন্তু তাহার শ্রমোৎপন্ন ফলে তাহার নিজের কোনও অধিকার নাই।

সংসারে এই যদি ন্যায়বিচার হয়, তবে চোরকে কেন নিন্দা করি? দস্যুকে কেন অভিসম্পাত করি? যদি বিচারক, শান্তিরক্ষক এবং ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ লর্ড বিশপ ইত্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রজাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে সে বিচারক, সে শান্তিরক্ষক, সে লর্ড বিশপ নিযুক্ত না করিয়া, প্রজাদিগকে চোর ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিলেই তো ভাল হয়।

বস্তুতঃ, এ সংসারে যত দিন বিচারক, শান্তিরক্ষক এবং ধর্ম্মশিক্ষার্থ লর্ড বিশপের প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন কৃষকদিগকে—নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে নিশ্চয়ই এইরূপ ক্লিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু দেবীসিংহ কেবল কৃষকদিগকে প্রহার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার কারাগারে জমিদার, তালুকদার এবং প্রজার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত আনীত হইলেন।

এ কারাগারে শিশু সন্তান বক্ষে করিয়া জননী ক্রন্দন করিতেছেন; দেবী-সিংহের সিপাহীগণ তাঁহার পৃষ্ঠের উপর বারংবার বেত্রাঘাত করিতেছে। এই রমণীদিগের প্রতি বিবিধ প্রণালীতে যে সকল বিবিধ বীভৎস ভীষণ

অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তরে লিখিত হইলে, পুস্তক নিশ্চয়ই অশ্লীলতাপূর্ণ হইয়া পড়িবে। পাঠক ও পাঠিকাগণ লেখককে একজন নিতান্ত জঘন্য রুচির লোক বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই সকল বিষয় একেবারে উল্লেখ না করা উচিত বোধ হয় না।

শত শত কুলকামিনী দেবীসিংহের কারাগারে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ইঁহাদের চীৎকার ও আর্ত্তনাদে কারাগার নিনাদিত হইতেছে। কারাগারের প্রহরিগণ কোনও রমণীকে বিবস্ত্রাবস্থায় প্রহার করিতেছে; কোনও রমণীর স্বামীর সম্মুখে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত সিপাহীদিগের জেম্মা করিয়া দিতেছে; * কোনও রমণীর ক্রোড়স্থিত শিশুকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিবামাত্র জননী শিশুকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রাণপণে হস্ত দ্বারা স্বীয় বক্ষের মধ্যে তাহাকে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন; অসংখ্য বেত্রাঘাত জননীর হস্তে পড়িতেছে!

* * * * *

পাঠক! এই ভীষণ অত্যাচারের বিষয় লিখিতে লেখনী আর অগ্রসর হয় না, হস্ত কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—নানা ধুন্ধুপন্থ অপেক্ষাও কি দেবীসিংহ সমধিক নরাধম ছিল না? নানা ধুন্ধুপন্থের নাম শুনিলেই লোকের ঘৃণার উদয় হয়। কিন্তু দেবীসিংহের এই অত্যাচার যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং হেষ্টিংসের পক্ষের সমুদয় ইংরাজ দেবীসিংহকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই তো পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সদ্বিচার! এই তো তৎকালের সুসভ্য ইংরাজদিগের সদাচরণ!

রঙ্গপুর দিনাজপুরের যে সকল লোকের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা এখন পর্য্যন্তও দেবীসিংহের কারাগারে আনীত হয়েন নাই, তাঁহারা এই সকল ভীষণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া প্রথমে আপন আপন বিষয় সম্পত্তি, পরে সন্তান-সন্ততি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া খাজনা আদায় দিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশের সকলেই আপন আপন ঘর, বাড়ী, গরু বিক্রয় করিবার নিমিত্ত লালায়িত। খরিদ্দার একেবারেই নাই। সুতরাং যে সকল গরুর মূল্য

* Vide note (14) in the appendix.

বিশ পঁচিশ টাকার ন্যূন ছিল না, তাহা এক টাকা দেড় টাকায় বিক্রয় হইতে লাগিল। বাজারে দশ মণ ধান্য এক টাকায় বিক্রয় হইতেছিল। *

* * * * *

নবম অধ্যায়।

প্রাণনগরের জঙ্গল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামানন্দ গোস্বামী ধৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবধূ সত্যবতী দেবী, বৃদ্ধা দাসী এবং বিশ্বস্ত প্রজাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া, প্রাণনগরের নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাণনগরের জঙ্গল হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ। এই সকল হিংস্র জন্তুর ভয়ে দিনেও কেহ এ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে, এ দেশীয় দুর্ব্বল লোকেরা এই সকল হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও কোম্পানির সিপাহী এবং সাহেবদিগকে সমধিক ভয় করিত। সুতরাং কোম্পানির লোকের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত বঙ্গমহিলা পরমা সাধ্বী সত্যবতী দেবী প্রাণনগরের হিংস্রজন্তুদিগের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মাঘ মাস। দিনাজপুরের উত্তর প্রান্তের সেই দারুণ শীত নিবারণার্থ সত্যবতীর পরিধেয় বস্ত্রখানি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। রামানন্দ গোস্বামীর স্ত্রী সুনীতি দেবী। সুনীতি দেবীর মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রবধূ সত্যবতী, প্রত্যেক বৎসর শীতকালে দেশের সমুদয় কাঙ্গাল গরীবদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাদিগের কষ্ট নিবারণ করিতেন। গরীবদিগকে শীতবস্ত্র প্রদানার্থ প্রত্যেক বৎসর সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিতেন। কিন্তু আজ শীত নিবারণার্থ তাঁহার সঙ্গে একখানি বস্ত্রও নাই। রামানন্দের শিষ্যগণ মধ্যে প্রায় সকলেই প্রত্যেক বৎসর শীতকালে তাঁহাকে এক এক জোড়া কাশ্মীরি শাল পাঠাইয়া দিতেন। এত অসংখ্য অসংখ্য শাল রুমাল যাঁহার

---

* Vide note (15) in the appendix.

ঘরে ছিল, আজ তাঁহার পুত্রবধূ একবস্ত্রা কাঙ্গালিনীর বেশে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল প্রাণনগরের জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গসমাজস্থ কোনও লোকের সাধ্য হইল না যে, আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারা এই রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করেন। ধিক্ বঙ্গসমাজ! ধিক্ বঙ্গদেশ! এই দেশ একবারে উৎসন্ন গেলেই ভাল ছিল।

একবস্ত্রা সত্যবতী দেবী জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া রাত্রি অতিবাহন করিতেছেন। নৈশ-তুষার-বিন্দুতে পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র হইয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তুষারবিন্দু পতিত হইতেছে। কিন্তু হৃদয়স্থিত প্রেম, ভক্তি এবং স্নেহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! আর্দ্র-বসন-পরিধানা দেবী সত্যবতী নিজের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া কেবল শ্বশুরের বিপদের বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার নিজের কোনও শারীরিক কষ্টানুভব হইতেছে না। বৃদ্ধ শ্বশুরের কষ্ট যন্ত্রণার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজের শারীরিক কষ্ট একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শ্বশুরের উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিবেন বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু দুঃখের নিশা সত্বর সত্বর অবসান হয় না। সত্যবতী ভাবিতেছেন, রাত্রি অবসান হইলেই শ্বশুরের উদ্ধারের কোনও উপায় অবলম্বন করিবেন। সুতরাং দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইয়াছে যে, আর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই রাত্রি শেষ হইবে। কিন্তু কত অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিয়া গেল, এ দুঃখের নিশা আর অবসান হয় না। তখন তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। কি উপায়ে শ্বশুরকে উদ্ধার করিবেন, সেই বিষয়ে রূপা এবং জগার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

পাঠকগণের জ্ঞাত করণার্থে আমরা এই স্থানে জগা এবং রূপার পরিচয় প্রদান করিতেছি। ইহাদিগের পিতা মাধব দাস রামানন্দ গোস্বামীর বাটীর সংলগ্ন খামার জমির প্রজা ছিল। অতি বাল্যকালে ইহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইলে পর, পরম দয়াবতী রামানন্দের সহধর্ম্মিণী সুনীতি দেবী অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া ইহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের তখন জমি চাষ করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু সুনীতি দেবী ইহাদের পিতার চাষের জমি অন্য লোক দ্বারা চাষ করাইয়া, চাষের খরচা ইত্যাদি বাদে, যাহা কিছু লাভ হইত, তাহা এই দুই নিরাশ্রয় বালকের নিমিত্ত আমানত করিয়া রাখিতেন। ইহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন সুনীতি ইহাদিগের

গৃহ প্রস্তুত এবং চাষের গরু ক্রয় করিবার নিমিত্ত, সেই আমানতি টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। রামানন্দ গোস্বামীকে ইহারা পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার মঙ্গলার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

বস্তুতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্ব্বে এ দেশের জমিদারগণ আপন আপন রায়তদিগকে সন্তানের ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতেন। রায়তগণও আপন আপন ভূম্যধিকারীকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পর ক্রমে জমিদারদিগের দেয় রাজস্ব নানা প্রকারে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমির উপর জমা ধার্য্য হইল। সেই হইতেই ভূম্যধিকারিগণ অনন্যোপায় হইয়া প্রজার জমাও বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তন্নিবন্ধন প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রারম্ভ হইতে যতই ভূমির কর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই রায়ত এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে দিন দিন বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইতেছিল।

মুসলমানদিগের আমলে কোনও জমিদারকে কখনও আপন প্রজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয় নাই। কোনও প্রজাও আপন জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যে কখনও কোনও নালিশ করিয়াছে, তাহা বড় শুনিতে পাই না। জমিদারগণ প্রজাকে কখনও তাহার বসত বাটী হইতে উৎখাত করিতেন না। অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী রাজা টিপু সুলতানের রাজত্বকালেও মহীসূর প্রদেশের জমিদারগণ প্রজাকে তাহার বসত বাড়ী হইতে উৎখাত করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। রাজপুতানা প্রদেশে প্রত্যেক রায়ত আপন আপন বসত বাড়ীকে "বাপোতা" অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত করে।

* * *

১৭৭১ সালে যে সময় রামানন্দের পুত্র প্রেমানন্দকে দেবীসিংহের পূর্ণিয়ার কাছারিতে ধরিয়া নিয়াছিল, তখন রূপা এবং জগা মালদহে তাহাদের নিজ বাড়ীতে ছিল। লোকপরম্পরায় রামানন্দ গোস্বামীর বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া, ইহারা দুই ভাই আপন আপন স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক পূর্ণিয়ায় চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানে রামানন্দের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল না। রামানন্দ ইহাদিগের পূর্ণিয়ায় পৌঁছিবার ছয়

মাস পূর্ব্বে তথা হইতে তাঁহার আর কয়েক জন বিশ্বস্ত প্রজাকে সঙ্গে করিয়া রঙ্গপুরে পলায়ন করিয়াছিলন। সেই সকল প্রজার বাড়ী পুর্ণিয়ায় ছিল। রূপা এবং জগা পুর্ণিয়ায় পৌঁছিয়া সেই সকল প্রজার পরিবারের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইল যে, রামানন্দ পলায়ন পূর্ব্বক রঙ্গপুরে গিয়াছেন। তখন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া ইহারা রামানন্দের অনুসন্ধানে রঙ্গপুরে যাত্রা করিল। রঙ্গপুরে অনেক অনুসন্ধানের পর রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই সময় হইতে ইহারা বরাবরই রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে আছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে জগা চারি পাঁচ বার মাত্র বাড়ী যাইয়া আপনার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। আর রূপা দুই বারের অধিক বাড়ী যায় নাই। ইহারা দুই ভাই কখনও একত্র হইয়া বাড়ী যায় নাই। রূপা যখন বাড়ী যাইত, জগা তখন রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আবার জগা বাড়ী গেলে রূপা থাকিত। এইরূপে জগা এবং রূপা রামানন্দের বিপদের ভাগী হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছিল। আজ ইহারা দুই ভাই এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রামানন্দের পুত্রবধূর নিকট বসিয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। এক একবার জঙ্গলের মধ্য হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিবামাত্র সত্যবতী চমকিয়া উঠিতেছেন। ইহারা তখন লাঠী হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নির্ভয় করিতেছে।

কিছু কাল পরে সত্যবতী বলিলেন—"রূপা! ঠাকুরকে উদ্ধার করিবার এখন কি উপায় করিব? এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে প্রহার করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে। তিনি এত দান ধর্ম্ম করিয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহার অদৃষ্টে কি অপমৃত্যু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন!"

রূপা বলিল "বউমা! আমি তখন বারবার তাঁহাকে বলিলাম—আপনিও আমাদের সঙ্গে একত্র হইয়া জঙ্গলের মধ্যে চলুন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন 'আমার পুত্রের যে দশা হইয়াছে, আমারও তাহাই হউক।' পুত্রশোকে বুড়া ঠাকুরের বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে গিয়াছে।"

সত্যবতী। কিন্তু এখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কি উপায় করা যাইতে পারে?

জগা। উদ্ধার তো এখন করিতে পারি। কয় জন বা বরকন্দাজ আসিতেছে! হয় তো তারা চারি পাঁচ জন লোক হইবে। আমরা দুই ভাই দুই খানা লাঠী

লইয়া গেলে সে পাঁচ জনার দফা নিকাশ করিয়া ঠাকুরকে ছিনাইয়া আনিতে পারি। কিন্তু তিনি যে তা করিতে নিষেধ করিবেন।

সত্যবতী। তিনি মনে করিয়াছেন যে, তিনি নিজে ধরা দিলে পর, আর কেহ আমাকে ধরিতে আসিবে না। তাই মনে করিয়া, আমাকে রক্ষা করিবার জন্য, এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

রূপা। বউমা! যে পথই অবলম্বন করুন, দেবীসিংহের হাত হইতে এড়ান বড় কষ্ট। ঠাকুর আপনাকে লইয়া কাশীতে যাইতে বলিয়াছেন। এখন আপনি যা বলেন, তাই করিব। যে পর্য্যন্ত আমাদের প্রাণ আছে, সে পর্য্যন্ত আপনাকে কেহ ছুঁইতে পারিবে না।

সত্যবতী। ঠাকুরকে এইপ্রকার ডাকাইতের হাতে রাখিয়া, আমার কাশীতে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতে যদি কেহ কখনও আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উপক্রম করে, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিব।

রূপা। তাঁকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনি কি করিতে বলেন?

সত্যবতী। তাঁহাকে দেবীসিংহের প্যাদাগণ ধরিয়া নিশ্চয়ই দিনাজপুর লইয়া যাইবে। আমরা তাহাদের পাছে পাছে দিনাজপুর যাইব। এত দূরে থাকিব যে, তাহারা আমাদিগকে চিনিতে না পারে। যদি রাস্তায় প্যাদাগণ তাঁহাকে প্রহার করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সকল দুষ্ট লোকের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিতে হইবে। তাঁহাকে প্রহার করিবে, এ কথা মনে হইলেও আমার বুক ফাটিয়া যায়। আর যদি বরকন্দাজেরা তাঁহাকে কোনও কষ্ট না দিয়া বরাবর দিনাজপুর লইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুর পর্য্যন্ত যাইব। সেখানে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। তাঁহারা এই বিপদের সময় তাঁহার উদ্ধারার্থ অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।

জগা। বউমা! আপনাদের দিনাজপুরের যত জমিদার শিষ্য ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই এখন জেলে পচিয়া মরিতেছে। আর কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। শিষ্য সেবকের ভরসা বড় করিবেন না। ঠাকুরকে ছিনাইয়া না আনিলে আর উদ্ধারের উপায় নাই। এখন আপনি যা বলেন, তাই করিব।

সত্যবতী। তোমরা মাত্র দুইটী লোক। দেবীসিংহের লোকেরা যদি তোমাদের দুই জনকেও ধরিয়া লইয়া যায়, তবে তো বড় বিপদে পড়িব!

সেই জন্যই ঝগড়া বিবাদ না করিয়া যাহাতে তাঁহাকে উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

রূপা। তবে আমরা তাঁহার পাছে পাছে দিনাজপুর গেলেই বা কি হইবে? তাঁহাকে দিনাজপুরে নিয়াই জেলে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। জেলের মধ্যে রাখিয়া প্রহার করিলে, আমরা তখন কি করিব?

সত্যবতী। জেলের মধ্যে যাইবার কোনও উপায় নাই?

রূপা। জেলের মধ্যে যাইতে দিবে কেন? সেখানে শত শত স্ত্রীলোক ও শত শত পুরুষদিগকে মারপিট করিতেছে।

সত্যবতী। তবে এখন ঠাকুরের উদ্ধারার্থ কি উপায় অবলম্বন করিব?

জগা। আমরা ছোট বেলা হইতে তাঁহার ভাত খাইয়া মানুষ হইয়াছি। আমরা প্রাণ দিয়া তাঁকে উদ্ধার করিতে পারিলেও এখনই করি। কিন্তু ইহার পর আর কোনও উপায় দেখি না। এখন আপনি যা বলিবেন, তাই করিব।

ইঁহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তায় রাত্রি অবসান হইল। প্রভাতে ইঁহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া দিনাজপুরের দিকে চলিলেন।

দশম অধ্যায়

হররাম।

১১৮৯ সনের মাঘ মাসে (১৭৮৩ সালের জানুয়ারি) দেবীসিংহের বরকন্দাজগণ কর্ত্তৃক রামানন্দ গোস্বামী ধৃত হইয়াছিলেন। বরকন্দাজগণ তাঁহাকে দেবীসিংহের তহসিল কাছারির সংলগ্ন কারাগারে আনিয়া রাখিল। কারাগারের নাম শুনিয়া পাঠকগণ মনে করিবেন যে, বর্ত্তমান সময়ের গবর্ণমেণ্টের জেলের ন্যায় হয় তো দেবীসিংহের কারাগার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের জেল যে প্রণালীতে গঠিত হয়, সেই প্রণালীতে নির্ম্মিত কোনও কারাগার পূর্ব্বে এ দেশে কখনও ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেসনে অভিযুক্ত আসামীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ একখানি, কি দুইখানি স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, পূর্ব্বে বড় বড় জমিদারদিগের তহসিল কাছারিতে সেইরূপ দুই একখানি মসিল-

ঘর থাকিত। জমিদারেরা কখনও কখনও কোনও দুশ্চরিত্র প্রজাকে চৌর্য্য ইত্যাদি অপরাধে ধৃত করিয়া দুই এক দিনের নিমিত্ত সেই ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাচীরশূন্য গৃহকেই লোকে কারাগার বলিয়া অভিহিত করিত। বর্ত্তমান সময়ে অপরাধীদিগকে প্রায় আজীবন কারাগারে থাকিতে হয়; সুতরাং এখন দীর্ঘ কালের বাসোপযোগী কারাগৃহ সকল নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে ঈদৃশ কারাগারের বড় প্রয়োজন হইত না।

দেবীসিংহের দিনাজপুরের তহসিল কাছারির সংলগ্ন কারাগারের চতুর্দ্দিকে কোনও প্রাচীর ছিল না। প্রাচীরশূন্য একখানি ঘরে জমীদার এবং কৃষকদিগকে ধরিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু ১১৮৮ সনের প্রারম্ভ হইতে এত অধিকসংখ্যক লোককে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল যে, সে গৃহে আর লোক ধরিত না। সময়ে সময়ে অনেকানেক লোককে গৃহের প্রাঙ্গণে রাখিয়া প্রহার করিতে হইত। রামানন্দ গৃহে প্রবেশমাত্রই অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সুতরাং কারাগারে প্রবেশের পর আর তাঁহাকে বড় প্রহৃত হইতে হয় নাই। তাঁহার কারাগারে প্রবেশের চারি পাঁচ দিন পরে যেরূপে তিনি কারামুক্ত হইলেন, তাহা এতৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে। দেবীসিংহের লোকেরা ১১৮৮ সনের প্রারম্ভ হইতে ১১৮৯ সনের অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের জমিদার, প্রজা এবং কৃষকদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহাই কেবল এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

দেবীসিংহকে প্রায় সর্ব্বদাই দিনাজপুরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহার হাতে বিবিধ কার্য্যের ভার রহিয়াছে। তিনি কলেক্টরের দেওয়ান। আবার দিনাজপুরের নাবালক রাজার ষ্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে দুই একবার ভিন্ন তাঁহার রঙ্গপুর যাইবার বড় সুবিধা হইত না। কিন্তু রঙ্গপুরের সমুদয় জমিও তিনি বেনামিতে ইজারা লইয়াছিলেন। রঙ্গপুরের ইজারার খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত তিনি ১১৮৮ সনের বৈশাখ মাসে (১৭৮১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল) কৃষ্ণপ্রসাদকে নিযুক্ত করিলেন। * কৃষ্ণপ্রসাদ রঙ্গপুরের সমুদয়

---

* Vide note (16) in the appendix.

জমিদারের নিকট বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত তলপ করিলে পর, কয়েক জন প্রধান প্রধান জমিদার দেবীসিংহকে দেশের দুরবস্থা জানাইবার নিমিত্ত, দিনাজপুর আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময় জমিদারদিগের আর বৃদ্ধি জমা প্রদান করিবার সাধ্য ছিল না। পূর্ব্বেই তাঁহাদের জমা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, এ বৎসর গবর্ণর জেনেরল ইস্তাহার দ্বারা ইজারাদারদিগকে আর বৃদ্ধি জমা তলপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীসিংহ মনে করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরলের ইস্তাহার কেবল লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চক্রান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং অভ্যাগত জমিদারগণ যখন বলিলেন যে, আর বৃদ্ধি জমা দিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া তাঁহাদিগের উপর মসিল বসাইলেন। তৎপরদিবস হররামকে সঙ্গে দিয়া বন্দীস্বরূপ এই সকল জমিদারকে রঙ্গপুর প্রেরণ করিলেন। হররাম রঙ্গপুর আসিয়া ইহাদিগের এবং অন্যান্য সমুদয় জমিদারের নিকট বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত তলপ করিল। আর কৃষ্ণপ্রসাদ, পূর্ব্বোক্ত জমিদারদিগকে দিনাজপুর যাইতে দিয়াছিলেন বলিয়া, বরখাস্ত হইলেন।

হররাম, কৃষ্ণপ্রসাদের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের ইজারার খাজনা তহসিলের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সমুদয় জমিদারকে কয়েদ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে আদেশ প্রদান করিল। বেত্রাঘাতেও যে সকল জমিদার বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত দিতে অস্বীকার করিলেন, তাঁহাদিগকে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ঢেড়া দিয়া, গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইয়া আনিতে হুকুম দিল।

দেশপ্রচলিত লোকাচারানুসারে এই প্রকারে দণ্ডিত লোকেরা একেবারে জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। সুতরাং দুই চারি জন জমিদারকে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করাইবামাত্র, বক্রী সমুদয় জমিদার, আপন আপন জাতি মান রক্ষার্থ, তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন।

কিন্তু কবুলিয়ত প্রদানের পরই হররাম জমিদারদিগের নিকট খাজনা-তলপ করিল। জমিদারদিগের এক পয়সা প্রদান করিবারও সাধ্য নাই। খাজনা আদায়ের নিমিত্ত হররাম তাঁহাদের সমুদয় নিষ্কর খামার জমি এবং গৃহসামগ্রী সকল নিলাম করাইতে আরম্ভ করিল। অত্যল্প মূল্যে এই সকল নিষ্কর জমি দেবীসিংহের লোকেরা ক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু

ইহাতেও দাবীকৃত খাজনা আদায় হইল না। যাহা কিছু আদায় হইত, তাহা সমুদয়ই আবওয়াব-স্বরূপ উসুল পড়িত; তদ্দ্বারা খাজনার দাবী কিছুই পরিশোধ হইত না। তখন জমিদারদিগকে হররাম আবার কয়েদ করিয়া বেত্রাঘাত করাইতে লাগিল। জমিদারদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত কাছারিতে আনিয়া অপমান করিল। যে সকল জমিদার বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত প্রদান করিয়া গোপৃষ্ঠারোহণস্বরূপ দণ্ড হইতে পূর্ব্বে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক একবার সেই গোপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হইল। দেবীসিংহের লোকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঢাক বাজাইয়া, তাঁহাদিগকে গ্রামের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনিতে লাগিল।

এদিকে জমিদারদিগের অধীন প্রজাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া, জমিদারদিগের নিকট প্রাপ্য খাজনা, ইংরাজকে দিতে তাহাদিগকে বলিল। প্রজার খাজনা দিবার সাধ্য নাই। তখন তাহাদের হাল গরু সমুদয় নিলাম করাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি রায়ত, সকলের উপরই ঘোর অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই সকল জমিদার, প্রজা এবং তাহাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা দিনাজপুরের কারাগারের অবস্থা লিখিবার সময়েই কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় আবার সবিস্তর উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, দিনাজপুরের অত্যাচার-নিপীড়িত প্রজা এবং জমিদারগণ অগত্যা জঙ্গলে পলায়ন পূর্ব্বক ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মুখের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দেবীসিংহের অত্যাচার হইতে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু রঙ্গপুরের প্রজা এবং জমিদারদিগের সে উপায়ও রহিল না। হররাম বড় ধূর্ত্ত ছিল। কোনও জমিদার কি প্রজা পলায়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য সে গ্রামে গ্রামে পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করিল। সেই সকল পাহারাওয়ালাদিগের বেতনের নিমিত্ত জমিদারদিগের উপর আবার "চৌকিবন্ধি" নামে এক নূতন আবওয়াব ধার্য্য হইল।

এই সকল পাহারাওয়ালা আবার সর্ব্বদাই নিরাশ্রয় রায়তদিগের পরিবারের উপর ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক রায়ত আপন স্ত্রী এবং কন্যার অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের উৎকোচের টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরপিশাচ দেবীসিংহ হররামের ন্যায় পাপাত্মার দ্বারা এইরূপে দেশ উৎসন্ন করিবার উপক্রম করিল।

ঈদৃশ অত্যাচার নিবন্ধন দিনাজপুরের ন্যায় রঙ্গপুরেও সমুদয় জিনিসের মূল্য একেবারে হ্রাস হইয়া পড়িল। রঙ্গপুরে অধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইত। কিন্তু অধিকাংশ তামাকের ক্ষেত্র পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। আর যে কিছু তামাক এই কয়েক বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারও ক্রেতা জুটিল না। দেশপ্রচলিত অত্যাচার নিবন্ধন বিদেশীয় বণিকেরা তখন আর রঙ্গপুরে প্রবেশ করিতেও সাহস করিত না। রঙ্গপুর দিনাজপুর একেবারে শ্মশানক্ষেত্র হইয়া পড়িল।

হররাম এইপ্রকার অত্যাচার করিয়া কতক টাকা আদায় করিল। কিন্তু দেবীসিংহ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আরও অধিক টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত হররামকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। দিনাজপুরে স্বয়ং দেবীসিংহ অষ্টাদশ প্রকারের আবওয়াব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু হররাম রঙ্গপুরে একবিংশতি প্রকারের আবওয়াব উসুল করিতে লাগিল। হররাম দেবীসিংহের নিকট লিখিল যে, কৃষকগণ মধ্যে অনেকেই গৃহের সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়াছে। এখন তাহারা আপন আপন সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু খরিদ্দার মিলে না, সুতরাং টাকা আদায়ের কিছু বাধা হইতেছে। দেবীসিংহ হররামের এই পত্র পাইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু হররামকে বরখাস্ত করিলেন না। হররামকে তিনি বিশেষ কার্য্যদক্ষ বলিয়া জানিতেন। ১১৮৯ সনের আষাঢ় মাসে তিনি হররামের সঙ্গে একত্রে তহসিল উসুলের কার্য্য করিবার নিমিত্ত সূর্য্যনারায়ণকে নিযুক্ত করিলেন। সূর্য্যনারায়ণ হররাম অপেক্ষাও অধিকতর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদানার্থ আবার জমিদার, প্রজা এবং ইহাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহাতেও একটী টাকা আদায় হইল না। ইহার পর আবার দেবীসিংহ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভেকধারী সিংহকে রঙ্গপুর প্রেরণ করিলেন। ভেকধারী সিংহ নানা প্রকারের দুণ্ড প্রদান করিয়াও টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইল না। কিরূপেই বা আদায় করিবে? হররামের দৌরাত্ম্যে জমিদার প্রজা সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের আর এক

পয়সা দিবারও সাধ্য ছিল না। দেবীসিংহ যখন দেখিলেন যে, ভেকধারী সিংহের দ্বারাও কার্য্য উদ্ধার হইল না, তখন ১১৮৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে স্বয়ং রঙ্গপুর আসিলেন। তিনি প্রজা ও জমিদার ভিন্ন, মহাজনদিগের উপরও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবীসিংহের এই শেষবারের অত্যাচারে প্রজাগণ বলিয়া উঠিল—"যায় প্রাণ যাউক, অত্যাচারীর রক্ত দ্বারা মৃত বন্ধুবান্ধবদিগের তর্পণ করিতে হইবে।" এত দিনের অত্যাচারের পর নির্ব্বোধ রঙ্গপুরের অধিবাসীদিগের জ্ঞানের উদয় হইল। অত্যাচারের অবরোধ করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু পূর্ব্বে এই শুভ বুদ্ধির উদয় হইলে আর এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। হীনবুদ্ধি বাঙ্গালীর নিদ্রা কখনও সহজে ভঙ্গ হয় না। সুতরাং চিরকালই তাহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

নান্কু।

বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। দেবীসিংহের দিনাজপুরের তহসিল কাছারীর কারাগারস্থ কয়েদিগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ শরীরবেদনায় ক্ষীণস্বরে রোদন করিতেছে, কেহ বা একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একটী রমণীর ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তান প্রহারে এবং অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছে। রমণী পুত্রশোকে এবং নিজের শরীরের যাতনায় একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তিনি কখনও হাসিতে-ছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও গান করিতেছেন।

বৃদ্ধ রামানন্দ গোস্বামীকে বরকন্দাজগণ গত কল্য এখানে আনিয়াছে। তিনি এই দুই দিবস পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়াই বরকন্দাজগণ অত্যন্ত প্রহার করিয়াছিল, সেই প্রহারের পর আবার দশ বার ক্রোশ রাস্তা বরকন্দাজদিগের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। যে রামানন্দ গোস্বামী পাল্কী ভিন্ন কখনও শিষ্যদিগের বাড়ী গমনাগমন করি-তেন না, রৌদ্রের সময় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ঘরের বাহির হইলে ভৃত্যগণ যাঁহার

মস্তকের উপর ছাতা ধরিত, শত শত শিষ্য যাঁহার পাদুকা মস্তকে বহন করিত, তাঁহার পক্ষে দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা দুর্ব্বল বঙ্গবাসিগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। রামানন্দ গোস্বামীর বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে। সুতরাং প্রহার এবং পদব্রজে গমনে অত্যধিক অঙ্গসঞ্চালন নিবন্ধন তিনি হঠাৎ বাতব্যাধি-রোগগ্রস্ত হইয়া এইপ্রকার অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। এই রোগে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আজীবন তাঁহার শরীর বড় সুস্থ ছিল। তিনি সদাচারী এবং সচ্চরিত্র লোক। আহারাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একপ্রকার নিয়ম পালন করিতেন; সুতরাং জীবাত্মা সহজে এইপ্রকার সুস্থ দেহ হইতে বহির্গত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই এখন পর্য্যন্তও রামানন্দের মৃত্যু হয় নাই; কেবল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।

তহসিল কাছারির জমাদার রামসিংহ, কয়েদীদিগের থাকিবার গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। একটি চৌদ্দ কি পনের বৎসরের বালক পরিধেয় ধুতির উপর চাপকান, তাহার উপর আবার আঁটা সাঁটা একটা মোটা কাপড়ের ছেনাবন্ধ পরিধান করিয়া বারাণ্ডার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। বালকটি ঘরের ভিতরে কি আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, একদৃষ্টে ঘরের দ্বারের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। বালকের প্রশস্ত ললাটে বিভূতির রেখা রহিয়াছে।

রামসিংহ দিনাজপুরের কলেক্টরের জমাদার। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান পঞ্জাব দেশ। দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত দিনাজপুরেই বাস করিতেছেন। কলেক্টরের দেওয়ান দেবীসিংহ রামসিংহকে তাঁহার ইজারার তহসিল কাছারির কারাগারের অধ্যক্ষস্বরূপ এখানে পাঠাইয়াছেন। রামসিংহের এখানে আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেবীসিংহ দেওয়ান। দেওয়ানের হুকুম অমান্য করিতে পারেন না। তাহাতেই এখানে আসিয়াছেন। তহসিল কাছারিতে কোম্পানির লোক দেখিলে জমিদার ও প্রজাদিগের বিশেষ ভয় হইবে, সেই জন্যই দেবীসিংহ কলেক্টরের জমাদার রামসিংহকে এই কারাগার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। রামসিংহ এখানে আসিতে একবার আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব ঠিক একটি গুড্‌ল্যাডের

ন্যায় (উত্তম বালকের ন্যায়) দেবীসিংহের কোনও কার্য্যেই বাধা দিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের যাহা কিছু উপরি পাওনা, তাহা দেবীসিংহ জুটাইয়া দিত। কার্য্যকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি দেবীসিংহের ক্রীতদাস ছিলেন। আর সম্পর্কে তিনি দেবীসিংহের মাস্‌তত ভাই। পাঠকগণ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। গুড্‌ল্যাড্ এবং দেবীসিংহ ইঁহারা দুই জন ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্নজাতীয় হইলেও "চোরে চোরে যে মাস্‌তত ভাই," তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রামসিংহ অগত্যা দেবীসিংহের তহসিল কাছারিতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনাজপুরের সহর হইতে এই তহসিল কাছারি দুই ক্রোশ ব্যবধান।

এই তহসিল কাছারির অত্যাচার দর্শনে রামসিংহের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইত। রামসিংহ একজন শিখ সুবেদারের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তো আর কলিকাতাস্থ বেনিয়ান কিংবা দেবীসিংহের ন্যায় নর-পিশাচ নহেন। দশ বার বৎসর হইল রামসিংহের পুত্র মরিয়া গিয়াছে। তাঁহার সন্তানাদি আর কিছুই নাই। পরিবারের মধ্যে কেবল এক স্ত্রী আছেন।

কারাগারের প্রাঙ্গণে চৌদ্দ পনের বৎসর-বয়স্ক বালকটীকে দেখিয়া, রাম-সিংহ তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিলেন। রামসিংহ বালকবালিকা দেখি-লেই তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বড় ভালবাসিতেন।

এই বালকটী রামসিংহের নিকটে আসিলে পর, ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ইহার সহাস্য মুখখানি দেখিয়া তিনি একেবারে মোহিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমন সুন্দর বালক আর এ জন্মে কোথাও দেখেন নাই। সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার বালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার নাম কি ?"

বালক। হুজুর, আমার নাম নান্‌কু।

রাম। তোমার বাড়ী কোথায় ?

বালক। হুজুর, আমার বাবার বাড়ী গয়া জিলায় ছিল। বাবা পূর্ণিয়ায় জমাদার ছিলেন। ছোট বেলা আমার মা বাপ মরিয়া গিয়াছেন। পরে

এই দেশের এক গোয়ালিনী আমাকে প্রতিপালন করিয়া বড় করিয়াছেন। সেই গোয়ালিনীকে মা বলিয়া ডাকি।

রাম। এখানে কি চাও?

বালক। হুজুর, এখন বড় হইয়াছি। কোথাও চাকরি জুটিলে চাকরি করিতাম। বাঙ্গালীর চাকরি আর করিব না। বাঙ্গালী জাতি বড় দুষ্ট। খাটাইয়া পূরা তলব দেয় না।

রাম। তুমি কি কাজ করিতে পার?

বালক। আজ্ঞে সকল কাজই করিতে পারি। তামাক সাজিয়া দিতে পারি। জল তুলিতে পারি। সিদ্ধি ঘুটিতে পারি।

রামসিংহ বালকটীর অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াই পূর্ব্বে মোহিত হইয়াছেন। এখন ইহার আবার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিবামাত্র ইহার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইল। বালকটীকে আপন গৃহে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। বালকটীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কত তলপ পাইলে কাজ করিতে পার?"

বালক। হুজুর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যা'দেন, তাতেই আপনার কাজ করিতে রাজি আছি।

রাম। আচ্ছা, মাস এক এক টাকা করিয়া তলপ দিব। তুমি আমার কাজ কর।

বালক রামসিংহের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত সিদ্ধি ঘুটিতে আরম্ভ করিল। রামসিংহ প্রত্যহ অপরাহ্লেই সিদ্ধি খাইতেন। বালক অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অত্যুৎকৃষ্ট সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া দিল। সিদ্ধি প্রস্তুত সম্বন্ধে ইহার নৈপুণ্য দেখিয়া রামসিংহ বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। কিছু কাল পরে ঘরের মধ্য হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে একজন কয়েদীর রোদনের শব্দ শুনা গেল। বালকটী রামসিংহকে বলিল "হুজুর, ঐ লোকটা একটু জল চায়, একটু জল দিব?"

রামসিংহ। 'দেও বাবা, থোড়া পানী ওস্‌কো দেও। হারামজাদা দেবীসিংহ ওন্ লোক্‌কো বহুৎ তক্‌লিব্ দিয়া।'

বালক এই সুযোগে গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরের এক পার্শ্বে দেখিল যে, রামানন্দ গোস্বামী অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য কয়েক জন কয়েদীকে একটু

একটু জল পান করাইয়া, পরে রামানন্দের কাছে গেল। রামানন্দ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে জাগ্রৎ করিতে পারিল না। রামানন্দের মস্তকে জল সেচন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তিনি হাঁ করিয়া জলপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বালক তাঁহার মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে লাগিল। রামানন্দ একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু এখনও তিনি পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। বালকটী আবার বাহিরে আসিল। রামসিংহের হুকুম অনুসারে দুই একটী কাজ সম্পন্ন করিয়া, কারাগার হইতে একটু দূরে একটা মাঠের মধ্যে চলিয়া গেল। সেখানে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দুইজন যুবক রহিয়াছে। বালক ইহাদিগের নিকটে আসিয়া বলিল, "রূপা, কোথা হইতে একটু দুগ্ধ আনিয়া দিতে পার? ঠাকুর বোধ হয়, ধৃত হইয়া আসিবার পর কিছুই আহার করেন নাই। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।"

রূপা তৎক্ষণাৎ দুগ্ধের তল্লাসে চলিয়া গেল।

বালক বৃদ্ধাকে বলিল "রূপা দুগ্ধ আনিলে তুমি সেই দুগ্ধ লইয়া কারাগারের প্রাঙ্গণে যাইবে; এবং নান্‌কু বলিয়া ডাকিলেই আমি ঘরের মধ্য হইতে আসিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া বালক আবার কারাগারে আসিল। কিন্তু সায়ংকালে রামসিংহ কারাগারের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার নিজের থাকিবার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। বালক কারাগারের দরজা বন্ধ দেখিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। কারাগার হইতে একটু দূরেই রামসিংহের থাকিবার ঘর। বালক আবার রামসিংহের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। বালকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রামসিংহ মনে করিলেন যে, সে তাঁহার নিকট কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছে।

রামসিংহ জিজ্ঞাসা করিল "নান্‌কু, আমার নিকট কিছু বলিতে চাও?"

বালক কিছু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "হুজুর, একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু বড় ভয় হয়; পাছে আপনি রাগ করেন।"

রামসিংহ বলিল "কিছু ভয় নাই। তোমার যা বলিবার থাকে বল।"

"আজ্ঞে এই কারাগারে একটি কয়েদী একটু দুধ খাইতে চাহিয়াছিল। সে তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই খায় নাই। আমার মাকে আমি তাহার নিমিত্ত একটু দুধ আনিতে বলিয়াছি। কিন্তু কারাগারের দরজা বন্ধ হইয়াছে।"

রামসিংহ। তার জন্য তোমার ভয় কি? এই চাবী নিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে যাও। শালা দেবীসিংহ বড় বজ্জাৎ। এ লোকগুলিকে প্রাণে মারিয়া ফেলিল। বাবা! আমার কোনও সাধ্য নাই। নহিলে আমি সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতাম। কয়েদীদিগের প্রতি তোমার দয়া দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। বাবা! আমার পুত্রেরও কয়েদীর উপর এইরূপ দয়া ছিল।

এই কথা বলিবামাত্রই রামসিংহের চক্ষু হইতে বারংবার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

নান্‌কু চাবী নিয়া দরজা খুলিতে উদ্যত হইলে, কারাগারের পাহারা-ওয়ালা বরকন্দাজগণ তাহাকে দরজা খুলিতে নিষেধ করিল। কিন্তু রামসিংহ দরজা খুলিতে বলিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আর তাহারা নান্‌কুকে বাধা দিল না।

নান্‌কু দরজা খুলিলে পর, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটী ঘটীতে করিয়া কিছু দুগ্ধ লইয়া কারাগারের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। নান্‌কু বলিয়া ডাকিবামাত্র, বালক বাহিরে আসিয়া তাহার হস্ত হইতে দুগ্ধের ঘটী লইয়া তাহাকে বিদায় দিল। বৃদ্ধা বিদায় হইয়া গেলে পর, বালক গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামানন্দের মুখে একটু একটু দুগ্ধ দিতে লাগিল। মস্তকে আবার জল সেচন করিল। কিছুকাল পরে রামানন্দ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুখের মধ্যে একটী বালক দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে দেখিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—"দুরাত্মা দেবীসিংহ এখন আমাকে জাতিভ্রষ্ট করিতে চাহে! কে তুমি আমার মুখের মধ্যে দুগ্ধ দিতেছ? হা পরমেশ্বর! আমি শূদ্রের স্পৃষ্ট কখনও স্পর্শও করি না। কে আমার মুখে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া আমাকে জাতিভ্রষ্ট করিল!"

বালক তখন রামানন্দের কাণের নিকট মুখ নিয়া বলিল "ভয় নাই—আমি সত্যবতী—আপনার পুত্রবধূ।"

"সত্যবতী" এই শব্দ বৃদ্ধের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র, বৃদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "হা পরমেশ্বর! আমার পুত্রবধূকেও ধরিয়া আনিয়াছে? আমি এখনই দেবীসিংহের মুণ্ডচ্ছেদন করিব।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ আবার অজ্ঞান হইয়া ভুমিতলে পড়িয়া গেলেন। কারাগারের পাহারাওয়ালাগণ বাহির হইতে ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "কি হইয়াছে?"

বালক বলিল যে, এই বৃদ্ধ কয়েদী যন্ত্রণায় একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাহারাওয়ালাদিগের বালকের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না। দেবীসিংহের কারাগারবাসী হতভাগ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ক্ষিপ্ত হইয়া কারাগার পরিত্যাগ করিত। কিন্তু পাহারাওয়ালাগণ চলিয়া গেলে পর, সত্যবতী অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে স্বীয় শ্বশুরের শিয়রে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখকমল অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। আবার বৃদ্ধের মস্তকে জল সেচন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জল সেচন করিলে পর রামানন্দের পুনর্ব্বার চৈতন্য হইল। সত্যবতী হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া আবার কাণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন—"আপনার ভয় নাই—আপনি কোনও কথা বলিবেন না—আমি পুরুষের বেশে আপনাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি—আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই।"

এই কথাগুলি বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিলে, ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। কিছুকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া, বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "মা! কেন তুমি আমার জন্য ব্যাঘ্রের মুখে আসিয়া পড়িয়াছ? তোমাকে চিনিতে পারিলে তো সর্ব্বনাশ করিবে!"

ছদ্মবেশী বালক বলিল, "আপনার কোনও ভয় নাই। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই আপনাকে কারামুক্ত করিতে পারিব। আপনি এই দুগ্ধ পান করুন, আমাকে অধিক সময় এখানে থাকিতে দিবে না।"

বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। সত্যবতী দরজা বন্ধ করিয়া রামসিংহের নিকট যাইয়া কারাগারের চাবী প্রত্যর্পণ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কারামুক্ত।

নান্কু দুই দিনের মধ্যেই রামসিংহের স্নেহাকর্ষণ করিল। রামসিংহের এখন আর সন্তানাদি কিছুই নাই। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, নান্কু অবশ্য কোনও ভদ্র হিন্দুস্থানীর সন্তান হইবে; দুরবস্থায় পড়িয়াছে

বলিয়াই চাকুরি করিতে আসিয়াছে; অতএব নান্‌কুকে চাকর না রাখিয়া পোষ্য পুত্র করিলে, তাঁহার স্ত্রী বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন, এবং তিনি নিজেও পুত্রশোক অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া রামসিংহ স্থির করিলেন, যত শীঘ্র পারেন, এই কারাগারের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেই, নান্‌কুকে সঙ্গে করিয়া দিনাজপুরে আপন গৃহে চলিয়া যাইবেন। রামসিংহের এখন আর চাকরি করিবারও বড় ইচ্ছা নাই। তাঁহার চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে। দেবীসিংহ তাঁহাকে এই কারাগারের কার্য্যে নিযোগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে "শালা" "বজ্জাৎ" ইত্যাদি সুললিত শব্দে অভিহিত করিতে থাকেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারেন না। দেবীসিংহ কলেক্টরের দেওয়ান। দেবী-সিংহ মনে করিলে তাঁহাকে অনায়াসে বরখাস্ত করাইয়া দিতে পারেন।

এদিকে সত্যবতী রামসিংহের নিকট হইতে অবসর পাইলেই কারা-গারের নিকটবর্ত্তী মাঠের মধ্যে যাইয়া বৃদ্ধা দাসী এবং জগা ও রূপার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। কি উপায়ে যে রামানন্দকে কারামুক্ত করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামানন্দের উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। তাঁহার হাঁটিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিলে প্রথম দিনই সত্যবতী তাঁহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতেন। অনেক চিন্তা করিয়া রূপা বলিল,—

"বউ মা! রাত্রে বুড়া ঠাকুরকে কয়েদীদিগের ঘরের বারাণ্ডায় শোওয়াইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, আমি অনায়াসে তাঁহাকে লইয়া পলা-য়ন করিতে পারি।"

জগাও এই কথায় সম্মত হইল। পরে ইহাদের মধ্যে এই পরামর্শ স্থির হইল যে, রামানন্দকে কারাগৃহের বারাণ্ডায় শোওয়াইয়া রাখিবেন। পরে রূপা কি জগা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পলায়ন করিবে।

সত্যবতী এই পরামর্শ স্থির করিয়া অপরাহ্ণে রামসিংহের নিকট প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় রামসিংহের নিমিত্ত সিদ্ধি বুটিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রে যে চারিজন বরকন্দাজের পাহারা ছিল, তাহা-দিগকেও কিঞ্চিৎ সিদ্ধি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সিদ্ধি প্রস্তুত হইলে পর রামসিংহ সায়ংকালে সিদ্ধি খাইয়া কারাগারের দরজা বন্ধ করিতে চলিলেন। নান্‌কু তখন তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—"হুজুর, এ বৃদ্ধ কয়েদীটি

বলে যে, কাল রাত্রে ঘরের মধ্যে গোলমালে তাহার একবারেই নিদ্রা হয় নাই, ও লোকটা বারাণ্ডায় শুইতে চাহে। ওর চলৎশক্তি নাই যে, পলাইয়া যাইবে। ওকে বারাণ্ডায় শুইতে দিবেন?"

রামসিংহ বলিলেন "ওর ইচ্ছা হইলে বারাণ্ডায় শুইতে পারে; যে কয়েদী পলাইয়া যাইতে পারে, সে যাউক না; আর কতদিন শালা দেবীসিংহ ইহাদিগকে যন্ত্রণা দিবে!"

তখন নান্‌কু বৃদ্ধ রামানন্দকে অতি কষ্টে ক্রোড়ে করিয়া বারাণ্ডায় আনিয়া রাখিলেন। রামানন্দ বারাণ্ডায় শুইয়া রহিলেন।

* * *

প্রথমরাত্রের পাহারাওয়ালাগণ আজ বিলক্ষণ সিদ্ধি খাইয়াছে। রাত্রি নয় ঘটিকার সময়েই তাহাদের নিদ্রাবেশ হইল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। রূপা, জগা এবং বৃদ্ধা দাসী কারাগার হইতে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রায় দেড় প্রহর রাত্রের পর নান্‌কু রামসিংহের ঘর হইতে বাহির হইয়া কারাগারের নিকট আসিল। রূপা এবং জগা তখন নান্‌কুর নিকট গেল। নান্‌কু তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কারাগারের বারাণ্ডায় উঠিল। রামানন্দ গোস্বামীর বাতব্যাধি হইয়াছে। প্রায়ই তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন; আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হয়। রূপা রামানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে কারাগারের প্রাঙ্গণে আসিল। এই সময় দ্বিতীয় প্রহরের পাহারাওয়ালাদিগের মধ্যে এক জন বরকন্দাজ জাগ্রৎ হইয়া দেখিল যে, রামানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া রূপা চলিয়াছে। তাহার পাছে পাছে জগা এবং বৃদ্ধা দাসী আর নান্‌কু দ্রুতপদসঞ্চারে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে।

"কয়েদী পলাইয়া যায়," "কয়েদী পলাইয়া যায়" বলিয়া বরকন্দাজ চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার চীৎকারে প্রায় বার চৌদ্দ জন প্যাদা ও বরকন্দাজ জাগ্রৎ হইয়া জগা ও রূপার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

রূপা রামানন্দকে জগার ক্রোড়ে দিয়া বলিল "তুমি ইহাদিগকে লইয়া পলায়ন কর। আমি এখানে দাঁড়াইয়া থাকি। ইহাদিগের সঙ্গে প্রাণপণে মল্লযুদ্ধ করিব। তাহা হইলে আর ইহারা তোমাদিগর পাছে পাছে যাইতে পারিবে না। এখানে থাকিয়া কেবল আমাকে ধরিবারই চেষ্টা করিবে।"

সত্যবতী বলিলেন "উহারা তোমাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিবে।"

রূপা তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল "আমি মরিলেও যদি তোমরা পলাইয়া যাইতে পার, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি একক মরিলেই বা কি? কিন্তু তোমাকে ধরিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে। তোমরা যাও যাও—শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাও।"

জগা রূপার কনিষ্ঠ ভাই। তাহার প্রতি রূপার বিশেষ স্নেহ রহিয়াছে। সেইজন্য জগাকে ইহাদিগের সঙ্গে যাইতে বলিয়া, নিজে প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিন চারি জন বরকন্দাজ নিকটে আসিবামাত্র হাতের লাঠির আঘাতে দুইজনকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিল। পরে দশ এগার জন বরকন্দাজ একত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বরকন্দাজগণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শূন্য হস্তে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই ছিল না। রূপা মনে করিলে অনায়াসে একদিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিত। কিন্তু পাছে বরকন্দাজগণ রামানন্দ এবং সত্যবতীকে ধরিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়, সেই আশঙ্কায় দাঁড়াইয়া ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চারি পাঁচ জনের প্রাণসংহার করিল। পরে লাঠি লইয়া আরও লোক আসিতে লাগিল। রূপা সুযোগ মতে পলাইবার অভিপ্রায়ে উত্তর দিকে দৌড়িতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকার। অকস্মাৎ সে একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। কিন্তু বরকন্দাজগণ তাহা দেখিতে না পাইয়া ক্রমে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। জগা এদিকে রামানন্দ গোস্বামীকে লইয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে চলিল।

রামসিংহ বরকন্দাজদিগের গোলমাল শুনিয়া জাগ্রৎ হইলেন। নান্কু বাহির হইতে কারাগারে অন্য লোক আনিয়া একজন কয়েদী লইয়া পলাইয়াছে, এই কথা শুনিয়া তিনি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু নান্কুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এখনও নান্কুর প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে। নান্কুর বিরুদ্ধে তিনি কোনও কথা বলিলেন না, কেবল দেবীসিংহকেই গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নান্কুকে যে তিনি পোষ্যপুত্র রাখিতে পারিলেন না, নান্কু যে পলাইয়া গিয়াছে, এই সকল দেবীসিংহেরই দোষে মনে করিয়া রামসিংহ সমস্ত রাত্রি কেবল দেবীসিংহের মাতা, ভগ্নী, পিসী, মাসী ইত্যাদি তাঁহার সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে অতিশয় অশ্লীল

তাঁহার গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি মধ্যে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না।

একজন বরকন্দাজ তাঁহাকে কারাগারের অন্যান্য কয়েদীদিগকে গণনা করিয়া দেখিতে বলিল। রামসিংহ সক্রোধে বলিলেন "হাম্ ছব্ কয়েদী লোক্‌কো ছোড় দেয়েগা—ছালা দেবীসিংকা ওয়াস্তে হামারা নান্‌কু ভাগ গিয়া—ছালা কুম্মাণ্ড হোচনকা বেনামে ইজারা লেকে মুল্লুক পয়মাল কিয়া।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইনি দেবতা না মনুষ্য !

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। জনপ্রাণীর শব্দ নাই। জগা রামানন্দ গোস্বামীকে স্কন্ধে করিয়া ক্রমে মালদহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৃদ্ধা দাসী এবং সত্যবতী জগার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইহারা গঙ্গারামপুরের সীমানায় পৌঁছিবামাত্র রাত্রি অবসান হইল। অন্যূন আট ক্রোশ রাস্তা জগা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে তাহার আহার করিবারও সুবিধা হয় নাই। এখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ইহাদের সাহস হইল না। রাস্তা হইতে কিছু দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। রূপা যেমন জগাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, জগাও আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। জগা এখন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রূপার নিমিত্ত কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সত্যবতী দেবী এবং বৃদ্ধা দাসীও অত্যন্ত বিলাপ এবং পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত সত্যবতীর দুইটি বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে ছিল। কিন্তু রূপা ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে অবস্থায় রূপাকে ইহারা ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাহাতে রূপার মৃত্যু সম্বন্ধে ইহাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। ইহারা মনে করিতে লাগি-

লেন যে, রূপা নিশ্চয়ই দেবীসিংহের লোকের হাতে প্রাণ হারাইবে। রূপার শোকে জগা অপেক্ষাও সত্যবতী দেবী সমধিক কাতর হইয়াছিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত তাহার নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রামানন্দ গোস্বামী এ পর্য্যন্ত প্রায় অজ্ঞানাবস্থায়ই ছিলেন। এখন তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইল। প্রভাত কালেই বাতব্যাধি-রোগগ্রস্ত লোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপে তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন, এবং যেরূপে রূপা নিজের প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগের পলায়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনিও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের বিলাপ ও পরিতাপে বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইল। রামানন্দ তখন একেবারে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সত্যবতী শ্বশুরের তৃষ্ণা নিবারণার্থে জগাকে নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল আনিতে বলিলেন।

তাঁহারা যে স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই স্থানে বহুসংখ্য বেলগাছ ছিল। শত শত সুপক্ক বেল বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে। গঙ্গারামপুরের সর্ব্বত্রই বেলগাছে পরিপূর্ণ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অতি প্রাচীনকালে এই গঙ্গারামপুরের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বাণ রাজার রাজধানী ছিল। তিনি শৈব ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্য বেলগাছে পরিপূর্ণ।

জগা জল আনিলে পর সত্যবতী বৃক্ষতল হইতে কয়েকটী বেল কুড়াইয়া আনিলেন। কেবল জল দ্বারা বেলের সরবত প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। পরে জগা এবং বৃদ্ধা দাসীকেও বেলের সরবত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইঁহারা বেলের সরবত পান করিয়া সকলেই একটু সুস্থ হইলেন। পরে বেলাবসানে আবার মালদহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরদিন বেলা দেড় প্রহরের সময় পাড়ুয়ার জঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সমুদয় পথ জগা রামানন্দকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছিল।

তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, পাড়ুয়ার জঙ্গলের মধ্যে কিছু কাল লুকাইয়া থাকিবেন। পরে দেবীসিংহের অত্যাচার কিছু হ্রাস হইলে, গৌড়ে রামানন্দ গোস্বামীর পৈতৃক বাড়ীতে যাইবার চেষ্টা করিবেন। রামানন্দের মালদহের ব্রহ্মত্র জমিও প্রায় আট নয় বৎসর হইল বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দৌরাত্ম্যে দেশের প্রায় সমুদয় লোকের নিষ্কর ব্রহ্মত্র ও দেবত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রামানন্দের বসত

বাটী হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোনও ইজারাদার তাঁহাকে বেদখল করে নাই। সেই বাড়ী শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বকেয়া খাজনার নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা কয়েদ করিবে, সেই আশঙ্কায়ই রামানন্দ পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়া থাকিতেন।

পাড়ুয়ার জঙ্গলে পৌঁছিয়াই, জগা জঙ্গলের মধ্যস্থিত কোনও জলাশয়ের নিকটবর্ত্তি স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে বাস করিবার সময় নিকটে জলাশয় না থাকিলে, সে স্থানে থাকিবার সুবিধা হয় না। জগা জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর প্রবেশ করিয়া একটী পুষ্করিণীর পারে দুই-খানি পর্ণ-কুটীর দেখিতে পাইল। তাহার একখানি কুটীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, আর একখানি কুটীরে একটী বিধবা রমণী যোগাসনে বসিয়া, ফুল চন্দন দ্বারা একাগ্রচিত্তে স্বহস্তনির্ম্মিত মৃন্ময় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেছেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র জগার মনে এইপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইল—ইনি দেবতা না মনুষ্য! কিন্তু স্ত্রীলোকটীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বিশেষতঃ রমণী নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে জগার সাহস হইল না।

জগা এইরূপ সুবিমল পবিত্রমূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুতঃ এই ধ্যানশীলা রমণীকে দেখিলে, কেহই বোধ হয় ইঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারে না। জগা বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছে যে, জঙ্গলের মধ্যে অনেকানেক দেব দেবী বাস করেন। সুতরাং সে সহজেই সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি নিশ্চয়ই দেবকন্যা হইবেন। কিন্তু ইঁহার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি না, তাহাই সে তখন চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মনে করিল—জঙ্গলের মধ্যে যে সকল অপদেবতা কিংবা ভূত প্রেত থাকে, তাহারাই লোকের অনিষ্ট করে। ভাল দেবতারা কখনও লোকের অনিষ্ট করেন না। এই দেবকন্যার মুখে যখন দয়া এবং স্নেহের ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে, তখন ইনি ভাল দেবতাই হইবেন। সুতরাং ইঁহার আশ্রয় পাইলে এই বিপদের সময় অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই ভাবিয়া জগা মনে মনে স্থির করিল যে, রমণীর শিবপূজা সমাপ্ত হইলেই তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রমণী, স্বীয় পরিধের বস্ত্রের অঞ্চল গলদেশে জড়াইয়া, গলবস্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান্ দেবদেব মহাদেব!

এ চিরদুঃখিনীকে যদি আরও দুঃখ কষ্ট দিতে হয় দেও,—কিন্তু প্রেমানন্দকে আশীর্ব্বাদ কর—শত্রুহস্ত হইতে তাহাকে নিরাপদে রাখ।"

"প্রেমানন্দকে আশীর্ব্বাদ কর"—"তাহাকে নিরাপদে রাখ" এই কথা জগার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—ইনি কোন প্রেমানন্দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? মালদহে আমাদের প্রেমানন্দ ভিন্ন আর যে কোনও প্রেমানন্দ আছেন, তাহা তো জানি না। কিন্তু আমাদের প্রেমানন্দের তো প্রায় বার বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে।

রমণী এখনও অবলুণ্ঠিত মস্তকে স্তব পাঠ করিতেছেন। জগা অনিমিষ নেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু কাল পরে রমণীর স্তব পাঠ সমাপ্ত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিবামাত্র দেখেন যে, কুটীরের বাহিরে একটা দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী ইহাকে দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু জগা তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লোটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মা! আপনি কে? আর কোন্ প্রেমানন্দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া শিবপূজা করিতেছেন?"

রমণী জগার প্রশ্নের কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

জগা আবার বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল "মা! আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি। এই জঙ্গলে কিছুকাল পলাইয়া থাকিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। আমাদের গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রের নামও প্রেমানন্দ ছিল। আপনার মুখে সেই প্রেমানন্দ নাম শুনিয়া আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

রমণী এই কথা শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কোনও গুপ্তচর হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি জগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন্ প্রেমানন্দের পিতার কথা বলিতেছ?"

জগা। আজ্ঞে গৌড়ের রামানন্দ গোস্বামীর পুত্রের নাম প্রেমানন্দ ছিল। প্রায় দশ বার বৎসর হইল পূর্ণিয়ার জেলে প্রেমানন্দের মৃত্যু হইয়াছে।

রমণী। রামানন্দ গোস্বামী এখন কোথায় আছেন?

জগা। আজ্ঞে আপনার পরিচয় না জানিলে, সে কথা বলিতে সাহস হয় না।

রমণী। আমার দ্বারা তোমাদের কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

জগা। আপনি কে? দেবতা না মনুষ্য?

রমণী। আমি কে, তাহা তোমার জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। রামানন্দ গোস্বামী কোথায় আছেন, তাই বল।

জগা। আজ্ঞে আমাদের তো আপনি কোনও অনিষ্ট করিবেন না?

রমণী। রামানন্দ গোস্বামীর কোনও অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, আমি সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।

জগা। আপনি রামানন্দ গোস্বামীকে কি চিনেন?

রমণী। তাঁহার নাম শুনিয়াছি। তাঁহাকে কখনও দেখি নাই।

জগা। কাহার নিকট তাঁহার নাম শুনিয়াছেন?

রমণী। তাঁহার পুত্রের মুখে তাঁহার নাম শুনিয়াছি।

জগা। তাঁহার পুত্রের সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হইল? প্রায় বার বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রমণী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি নিশ্চয় জান তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?

জগা। আজ্ঞে হাঁ নিশ্চয় জানি। তাঁহার বিধবা স্ত্রী এবং তাঁহার পিতার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আছি।

রমণী। তাঁহার স্ত্রী কি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে?

জগা। তা কি আর করেন না? তা না করিলে সাদা কাপড় পরিবেন কেন? বিধবার ন্যায় হবিষ্য করিবেন কেন?

রমণী। প্রেমানন্দ পরমা সাধ্বী সুনীতি দেবীর গর্ভে জন্মধারণ করিয়াছেন। দেবীসিংহ কি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কোনও সাধ্য নাই যে, তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে।

জগা এবং রূপা ইহারা দুই ভাই সুনীতি দেবীকে জননী অপেক্ষাও সমধিক ভক্তি করিত। সুনীতি দেবীর নাম শ্রবণমাত্র জগার হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইল, তাহার চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; এবং এই রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিতে তাঁহার আরও সাহস বৃদ্ধি হইল। সে তখন রমণীর সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক বলিল—

"মা ! আপনি দেবী না মানবী ? প্রেমানন্দ ঠাকুর এখনও বাঁচিয়া আছেন, এ কথা তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শুনিলে বড়ই সুখী হইবেন। তিনি রোগে শোকে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। প্রেমানন্দ ঠাকুরের পিতা এবং স্ত্রী এই জঙ্গলের মধ্যেই আছেন। আমরা দেবীসিংহের জেল হইতে পলাইয়া আজ এখানে পৌছিয়াছি।"

জগার কথা শুনিয়া রমণী প্রেমানন্দের পিতা এবং স্ত্রীকে তাঁহার কুটীরে লইয়া আসিতে বলিলেন।

জগা তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া সত্যবতীর নিকট বলিল "বউমা! বড় শুভ খবর—ঠাকুরকে এখনই বল—এখনই বল, আমাদের প্রেমানন্দ ঠাকুর এখনও বাঁচিয়া আছেন। তিনি মরেন নাই।"

সত্যবতী, রামানন্দ এবং বৃদ্ধা দাসী জগার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রায় দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, প্রেমানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া জগার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জগা বারংবার বলিতে লাগিল "প্রেমানন্দ ঠাকুর এখনও জীবিত আছেন।"

সত্যবতী দেবী কিছুকাল পরে জগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি তাঁহাকে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও দেখিতে পাইয়াছ ?"

জগা। আজ্ঞে, আমি এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখি নাই। এই জঙ্গলের মধ্যে এক দেবকন্যা আছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রেমানন্দ এখনও জীবিত আছেন। সেখানে গেলেই তিনি সকল কথা আপনাদের নিকট বলিবেন।

সত্যবতী আবার বলিলেন "কেহ তো তোমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলে নাই ?"

জগা। কখনও না, তিনি সত্য সত্যই দেবকন্যা। তিনি কি কাহাকেও প্রতারণা করিবেন ? তাঁহার সহিত প্রেমানন্দ ঠাকুরের সাক্ষাৎ না হইলে তিনি মাতাঠাকুরাণীর নাম শুনলেন কার কাছে ? সেই দেবকন্যা বলিলেন যে, "পরমা সাধ্বী সুনীতি দেবীর গর্ভে প্রেমানন্দ জন্মিয়াছেন। তাঁহাকে কি কেহ মারিতে পারে ?"

সত্যবতী। দেবকন্যা আর কি কি বলিয়াছেন ?

জগা। আজ্ঞে, আমি যখন সেই কুটীরের নিকট গিয়াছি, তখন তিনি শিবপূজা করিতেছিলেন। তিনি দুই চক্ষু বুজাইয়া পূজা করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিতেও পান নাই। পূজা শেষ হইলে গলবস্ত্র হইয়া শিবের নিকট প্রণাম করিয়া বলিলেন "ভগবন্ দেবদেব মহাদেব! প্রেমানন্দকে আশীর্ব্বাদ কর, তাঁহাকে নিরাপদে রাখ।" আমি তখন তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলাম "মা! আপনি কোন্ প্রেমানন্দের মঙ্গলকামনা করিতেছেন? আমাদের এক প্রেমানন্দ ছিলেন। দশ বার বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন 'প্রেমানন্দ পরমা সাধ্বী সুনীতি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবীসিংহের সাধ্য কি যে, তাঁহার প্রাণবধ করে?' বউ মা! আমি এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, রূপা দাদাও মারা পড়িবে না। প্রেমানন্দের মা তাহাকে যখন পালন করিয়াছেন, কেহ তাহাকে প্রাণে মারিতে পারিবে না। রূপা দাদা দুই এক দিনের মধ্যেই এখানে আসিবে। কাল দিনে আমার একটু ঘুম হইয়াছিল। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রূপা দাদা আসিয়াছে।

জগার কথা শেষ হইলে পর সত্যবতী রামানন্দকে বলিলেন—"জগার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমারও একটি স্বপ্নের কথা স্মরণ হইল। যে দিন আপনার জামাতা এবং পুত্রকে দেবীসিংহের লোকেরা ধৃত করিয়া লইয়া গেল, সেই রাত্রে আমি শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। তখন স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যেন, শুভ্রবসন-পরিহিত একটি পরমা সুন্দরী রমণী আমার নিকট আসিলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাঁহার সেই সুবিমল প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার মুখের জ্যোতিতে আমার শয়ন-প্রকোষ্ঠ একেবারে আলোকিত হইল। স্ত্রীলোকটী ধীরে ধীরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'মা! আমাকে চিনিতে পার নাই, আমি তোমার শাশুড়ী।' এই কথা শুনিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। বারংবার আমার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন 'মা! বিপদে পড়িয়া কখনও ঈশ্বরকে ভুলিও না। বিপদ্ভঞ্জন হরি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকলপ্রকার বিপদ্ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন। পতির নিমিত্ত তুমি কেন এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ? আর দ্বাদশ বৎসর পরে তাহার সহিত তোমার সম্মিলন হইবে।'

আমি তাঁহার নিকট কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার বলিলেন 'ধন্য সেই জননী, যিনি প্রেমানন্দের ন্যায়

সুপুত্র গর্ভে ধারণ করেন; ধন্য সেই রমণী, যিনি প্রেমানন্দের ন্যায় পতি লাভ করেন।'

"এই কথা বলিয়া রমণী অন্তর্হিতা হইলেন। আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রভাতে মৃত শব অনুসন্ধানের পর যখন আপনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া গেল না, তখন আমার মনে হইল যে, হয় তো তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।"

সত্যবতীর বাক্যাবসানে রামানন্দ গোস্বামী বলিলেন "জগা! এখন আমাকে সেই দেবকন্যার কুটীরে লইয়া চল্। সে কুটীর কত দূর? আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব না?"

জগা ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণীর কুটীরে চলিল। কুটীর-বাসিনী রমণী সস্নেহে ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সত্যবতী এবং রামা-নন্দ উভয়েই রমণীকে দেখিবামাত্র মনে করিতে লাগিলেন—ইনি দেবতা না মনুষ্য!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কুটীরবাসিনী।

কুটীরবাসিনী রমণী সত্যবতী এবং রামানন্দ গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমার পরিচয় আপনারা ক্রমে শুনিতে পাইবেন। এই দুরবস্থায় পড়িবার পর এ সংসারে প্রেমানন্দ এবং লক্ষ্মণ ভিন্ন অপর কাহারও নিকট এ পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় প্রদান করি নাই। আর সে সকল দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আমার হৃদয়স্থিত শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সুতরাং আমার পরিচয় শুনিবার আপনাদের কোনও প্রয়োজন নাই। প্রেমানন্দ আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। আমিও তাঁহাকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলিয়া মনে করি, সুতরাং তাঁহার নিকট কেবল আত্মবিবরণ ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রেমানন্দ যেরূপে দেবীসিংহের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি”—

রমণী এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই রামানন্দ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন “এখন বাছা আমার কোথায় আছে? এই জঙ্গলের মধ্যে কি আছে? আগে আমি তাহাকে একবার দেখিতে চাই। পরে সকল কথা শুনিব।”

রমণী বলিলেন—“এখন তাঁহাকে কলিকাতা-জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চক্রান্ত করিয়া অন্যূন পনের জন লোককে জেলে রাখিয়াছে। সেই পনের জনের মধ্যেই প্রেমানন্দ একজন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত রঙ্গপুরের লোকেরা চেষ্টা করিতেছে। ৭ই মাঘের পূর্ব্বে তাঁহার এখানে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু আজ ৮ই মাঘ। কিজন্য তাঁহার এখানে আসিতে বিলম্ব হইতেছে জানি না।”

রামানন্দ রমণীর কথায় বাধা দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তাহার আসিবার নিমিত্ত ৭ই মাঘ একটা নির্দ্দিষ্ট দিন অবধারিত হইয়াছিল কেন?”

“৭ই মাঘ প্রেমানন্দের জন্মদিন। রঙ্গপুরের সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, সেই শুভদিনেই রঙ্গপুর এবং দিনাজপুরের অত্যাচার-নিপীড়িত লোকেরা অত্যাচারের অবরোধ করিতে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইবে। কিন্তু যখন তিনি এখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না, তখন বোধ হয় তাহাদের সমুদয় চেষ্টা উদ্যম বিফল হইয়াছে। আমি আজ তাঁহার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া শিবপূজা করিতেছিলাম।”

রামানন্দ। প্রেমানন্দ দেবীসিংহের হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিল?

রমণী আবার বলিতে লাগিলেন—

“আপনারা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, দুরাত্মা দেবীসিংহ সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ বারটি স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া রাখে। সাহেব সুবাদের মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত সে এই সকল স্ত্রীলোকদিগকে সময়ে সময়ে দুর্ম্মতি-পরায়ণ ইংরাজদিগের নিকট প্রেরণ করে। আমিও দুর্ভাগ্য-বশতঃ দেবীসিংহ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহার সেই স্ত্রী-খোয়াড়ে নিক্ষিপ্ত হইলাম। অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই জানে না যে, এই পাপাত্মা আমাকে কত যন্ত্রণা, কত কষ্ট প্রদান করিয়াছে।

"যখন স্বামিপুত্রশোকে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, কখনও কখনও প্রকাশ্য রাস্তায় বিচরণ করিতাম, তখন আমাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সেই ক্ষিপ্তাবস্থায়ও আমি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হই নাই। আমি কিছুতেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইলাম না। সেই সময়ের দুরবস্থা এবং আত্মবিপদ্‌চিন্তা আমার প্রবল অপত্যশোক ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিতে লাগিল। দুই চারি দিন পরেই আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলাম। তখন দেবীসিংহের ভয়ে সর্ব্বদাই পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লুকাইয়া রাখিতাম। নরাধম একবার আমাকে প্রতারণা করিয়া একটা ইংরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে তাহার চক্রান্ত জানিতে পারিলে কখনই যাইতাম না। আমাকে আপন বাড়ীতে প্রেরণ করিবার ছলনা করিয়া সেই ম্লেচ্ছের গৃহে পাঠাইল। দুরাত্মা ইংরাজ হস্ত বাড়াইয়া আমাকে ধরিতে উদ্যত হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার বক্ষে আঘাত করিলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত ছিল, তাহাতেই ছুরী বক্ষে প্রবেশ করিল না। কিন্তু সে নরাধম আর আমাকে স্পর্শ করিল না, সে দেবীসিংহের উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইল। দেবীসিংহ সেই সময় হইতে আর আমাকে কাহারও নিকট প্রেরণ করিত না। কিন্তু তাহার আশা ছিল যে, দুই চারি মাস পরে আমাকে বশীভূত করিতে পারিবে। ইহার পর অন্যান্য দশ বারটি স্ত্রীলোক সহ আমাকে লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণিয়া চলিল। আমি কিছুতেই পূর্ণিয়া যাইতে সম্মত হইলাম না। তখন আমাকে বন্ধন করিয়া পূর্ণিয়া লইয়া গেল। যে সকল স্ত্রীলোক প্রাণের ভয় করে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে, তাহাদিগকেই কেবল দুরাত্মারা অনায়াসে কুপথ-গামিনী করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার্থে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, এ ভূমণ্ডলে কেহই তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে না। আমি প্রায় দেড় বৎসর দেবীসিংহের স্ত্রী-খোয়াড়ে ছিলাম। পূর্ণিয়ায় আমি ভিন্ন আরও দশ জন স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন মুসলমান এবং চারি জন হিন্দু। সেই সরলপ্রকৃতি মুসলমান কুমারীদিগকে উচ্চপদস্থ সাহেব সুবার নিকট নিকা দিবে এইরূপ আশা দিয়াই প্রলুব্ধ করিত। কিন্তু হিন্দুমহিলাগণ বিলক্ষণ জানিত যে, ইংরাজকে স্পর্শ করিলেই তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে, সুতরাং

কেবল প্রহারের ভয়েই তাহারা অগত্যা আত্মবিক্রয় করিতে সম্মত হইত।

"পূর্ণিয়ায় দেবীসিংহের অধীনে একজন শিখ জমাদার ছিলেন। তাঁহার নাম লক্ষ্মণ সিংহ। লক্ষ্মণ যখন দেখিতে পাইলেন যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহি, তখন আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি আমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এক দিন অপরাহ্নে লক্ষ্মণ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা তিনি অত্যন্ত পাপ বলিয়া মনে করেন, নহিলে এত দিনে তিনি গোপনে আমার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিতেন। আমি লক্ষ্মণকে বলিলাম 'বাছা! স্বামিপুত্রশোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। আমার মৃত্যু হইলেই ভাল। তুমি অনর্থক আমার নিমিত্ত কেন বিপদে পড়িবে? যাহাতে আমি সত্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতেছি। বোধ হয় আর দুই এক মাস এখানে থাকিলে পরমেশ্বর আমাকে এ সংসারের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবেন।'

"লক্ষ্মণ আমার এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি একজন দীর্ঘাকার বীরপুরুষ। তাঁহাকে দেখিয়া যমের সহোদর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইপ্রকার বলবান্ সৈনিক পুরুষের হৃদয় যে এত কোমল, তাহা আমি কখনও জানিতাম না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'মা! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আপন গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করি। তোমার ধর্ম্মভাব, পবিত্রতার ভাব দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। দুরাত্মা দেবীসিংহ এখানে শত শত স্ত্রীলোক আনিয়া তাহাদিগকে সহজে কুপথগামিনী করিয়াছে। কিন্তু তোমার ন্যায় পরমা সাধ্বী আমি আর কোথাও দেখি নাই। বাবা নানক বলিয়াছেন যে, সাধ্বী রমণীগণ যেখানে বাস করেন, সেই একমাত্র তীর্থস্থান। আমি মনে করিয়াছি, আপন গৃহে রাখিয়া সস্ত্রীক তোমাকে দিন দিন জননীর ন্যায় অর্চ্চনা করিব। তুমি আমাকে আপন গর্ভজাত সন্তান মনে করিলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। তুমি আমার গৃহে থাকিলেই আমার গৃহ একটি পবিত্র তীর্থস্থান হইবে।'

"লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের উদয় হইল। তিনি যেরূপ দীর্ঘাকার বীর পুরুষ, তাহাতে তাঁহাকে দেখিলেই রমণীমাত্রের ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া

আমি তাঁহার পিঠের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম পোষিত সিংহের ন্যায় তিনি আমার পদতলে পড়িয়া রহিলেন।

"কিন্তু কিছুকাল লক্ষ্মণ মনে মনে কি চিন্তা করিয়া আবার আমাকে বলিতে লাগিলেন 'মা! আমার সন্তানাদি কিছুই নাই। একটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, তাহারও মৃত্যু হইয়াছে। আমি আর চাকরি করিব না। বিশেষতঃ দেবীসিংহের ন্যায় দুরাত্মার কিংবা এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য ম্লেচ্ছদিগের চাকরি করিলে নিশ্চয়ই লোকের দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে হয়। আমি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া স্বদেশে চলিয়া যাইব। একান্ত যদি দেবীসিংহ তোমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ (কটিদেশের তরবারি দেখাইয়া) এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু যত দিন তাহার অধীনে চাকরি করিব, ততদিন তাহার বিরুদ্ধে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিব না। নেমকহারামি অত্যন্ত গুরুতর পাপ। বাবা নানক বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহার বেতন গ্রহণ করিবে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাহার উপকার করিতে হইবে।'

"লক্ষ্মণ আমার নিকট এই সকল কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, আমি নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার সমুদয় কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে হঠাৎ আমার পশ্চাৎদিক্ হইতে চীৎকার শব্দ শুনিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম যে, একটা বৃক্ষের তলে একটি পরম সুন্দর যুবা পুরুষকে বধ করিবার নিমিত্ত দেবীসিংহের কয়েকজন বরকন্দাজ আয়োজন করিতেছে। গোপনে দেবীসিংহ যাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিত, তাহাদিগকে অন্দরের মধ্যে সেই বৃক্ষতলে আনিয়াই বধ করিত। যুবক বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া একজন বরকন্দাজের হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া নিয়া, তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। তাহাতেই বোধ হয় বরকন্দাজদিগের মধ্যে কেহ চীৎকার করিয়া থাকিবে।

"এই যুবকের মুখশ্রী দেখিয়া ইঁহার প্রতি আমার দয়ার সঞ্চার হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার ন্যায় সুপুত্রের শোকে ইঁহার জননী নিশ্চয়ই পাগল হইবেন। কিরূপে এই যুবকের প্রাণ রক্ষা হইতে

পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। যতই আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ততই ক্রমে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি লক্ষ্মণের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম 'বাছা লক্ষ্মণ! দেবীসিংহের লোকেরা একটি পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমারকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যদি তুমি আমার যথার্থই পুত্র হও, তবে আমার অনুরোধে তাঁহার প্রাণ রক্ষা কর।'

"লক্ষ্মণ বলিলেন 'এ বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই ব্রাহ্মণকুমারের নাম প্রেমানন্দ গোস্বামী। দেবীসিংহের প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে এই যুবক একখানি ছুরিকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। দেবীসিংহ যেরূপ লোক, তাহাতে ইহাকে কি তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন?'

"আমি বলিলাম 'আমার অনুরোধে তুমি অগত্যা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইহার প্রাণরক্ষা কর।' তখন লক্ষ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই বধ্যস্থানে আসিলেন। এবং বরকন্দাজদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন 'ইহাকে এখন বধ করিবার হুকুম নাই। রাত্রি দশ ঘটিকার পর যাহা হয় করিতে হইবে। ইহাকে আমার জেম্মা রাখিয়া তোমরা চলিয়া যাও।' বরকন্দাজেরা বলিল 'জমাদার সাহেব, এ শালা বড় বজ্জাৎ। একক ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না।'

"লক্ষ্মণ বলিলেন 'কিছু ভয় নাই। এমন সাতটা বাঙ্গালীকেও আমি একক ধরিয়া রাখিতে পারি।'

"বরকন্দাজগণ মনে করিল যে, হয় তো দেবীসিংহ পরে লক্ষ্মণকে এইরূপ হুকুম দিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাহারা প্রেমানন্দকে লক্ষ্মণের জেম্মা রাখিয়া চলিয়া গেল।

"দেবীসিংহ নিজেও লক্ষ্মণকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত। লক্ষ্মণ যে তাহার কুক্রিয়া সকল সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, তাহা দেবীসিংহ বিলক্ষণ জানিত। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও সে লক্ষ্মণকে বরখাস্ত করিতে ইচ্ছুক ছিল না। দেবীসিংহের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, লক্ষ্মণসিংহ কখনও মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার অর্থাপহরণ করিবেন না। সেই জন্যই দেবীসিংহ লক্ষ্মণকে মালখানার পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিল। লক্ষ্মণ, দেবীসিংহের মালখানার জমাদার ছিলেন।

"রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আকাশমণ্ডল হইতে চন্দ্রমা অদৃশ্য হইল। চতুর্দ্দিক্

আবার ঘোর অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িল। তখন লক্ষ্মণ গোপনে আমাকে তাঁহার গৃহে ডাকিয়া নিয়া সিপাহীর পোষাক পরিধান করিতে বলিলেন। আমি এবং প্রেমানন্দ উভয়েই সিপাহীর পোষাক পরিধান করিয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে সঙ্গে দেবীসিংহের মালকাছারির বাহির হইলাম। কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আর দুই জন লোক আমাদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে বলিলেন 'এই ব্রাহ্মণকন্যাকে আমি মাতার ন্যায় সম্মান করি। ইনি পরমা সাধ্বী। ইঁহাকে এবং যুবককে দিনাজপুরে আমার ভ্রাতা রামসিংহের বাড়ী পৌঁছাইয়া দেও। আর এই পত্রখানা রামসিংহকে দিবে।'

"আমরা লক্ষ্মণের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিলেন 'মা! আমি গুরু নানকের শিষ্য। এ জন্মে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। কিন্তু দেবীসিংহ কখনও এই ব্রাহ্মণকুমারকে ছাড়িয়া দিত না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আজ আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে হইল। অতএব আমি এখনই দেবীসিংহের নিকট যাইয়া বলিব যে, মাতৃবাক্যপালনার্থ আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। আমি আর তাহার চাকরি করিব না। তাহার ইচ্ছা হইলে বিশ্বাস-ঘাতকতার নিমিত্ত আমায় উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে পারে। আমি অবনত মস্তকে তাহার প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিব।'

"আমি লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। আমার মনে হইল যে, হয় তো দেবীসিংহ লক্ষ্মণের প্রাণবিনাশের আদেশ করিবে। আর লক্ষ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাসকতার দণ্ডস্বরূপ তাঁহার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইবেন। আমি তখন লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া বলিলাম 'বাছা! পুত্র-শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তার পর এই বিপন্নাবস্থায় তুমি যে আমাকে মা বলিয়া ডাকিতে, তাহাতে আমার একটু শান্তিলাভ হইত। এখন কি আমি তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে দিয়া আত্মরক্ষা করিব? আমি আবার তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইব। এই ব্রাহ্মণকুমারের কেবল পলায়নের সুবিধা করিয়া দেও।'

"লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া কিছু কাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন 'মা! তোমার ভয় নাই। আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার বাক্য আমি কখনও লঙ্ঘন করিব না। আমি বাঁচিয়া থাকিলে যদি তোমার সুখ হয়, তবে আমি কেবল তোমার সুখ

শান্তির নিমিত্ত জীবনধারণ করিব। আজ হইতে এ জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। তোমার সেবা শুশ্রূষা করাই আমার এ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে তুমি সুখী হইবে, তাহাই করিব। আজ হইতে তুমি আমার একমাত্র জননী, একমাত্র আরাধ্যা দেবী হইলে। দেবীসিংহের মালখানার চাবী এখনও আমার নিকট রহিয়াছে। আমি এখনই যাইয়া চাকরি পরিত্যাগ করিব, তাহার মালখানার চাবী তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব, এবং তাহাকে বলিয়া আসিব যে, যখন ব্রহ্মহত্যা করিতেও সে কুণ্ঠিত নহে, তখন আমি তাহার অধীনে চাকরি করিব না।'

"লক্ষ্মণ এই বলিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। আমরা তাঁহার নিযুক্ত লোক দুইটির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণগঞ্জের মধ্য দিয়া দুই দিন পরে দিনাজপুর আসিয়া পৌঁছিলাম।

"লক্ষ্মণের পত্র পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা রামসিংহ অতি সমাদরে আমাদিগকে তাঁহার গৃহে স্থান প্রদান করিলেন। রামসিংহের অন্তর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মণ আমাকে মা বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য রামসিংহও আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামসিংহ তখন বড় শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বাড়ী পৌঁছিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রেমানন্দকে রামসিংহ আপন গৃহে পাইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

"প্রেমানন্দ রামসিংহের স্ত্রীকে এবং আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই দিন পরে লক্ষ্মণ সিংহ চাকরি পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুর আসিলেন। লক্ষ্মণের স্ত্রীও রামসিংহের গৃহে অবস্থান করিতেন। তিনি পুত্রবধূর ন্যায় আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণ এবং তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এবং আমার দুঃখনিবারণের কোনও উপায় আছে কি না, তাহাই সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশেষে আমি তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-দুঃখ বিবৃত করিলাম।

* * *

"তখন প্রেমানন্দ এবং লক্ষ্মণ আমাকে রামসিংহের বাড়ী রাখিয়া, আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুসন্ধানার্থ দিল্লী যাত্রা করিলেন। দুই তিন মাস হইল প্রেমানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ এখনও

পঞ্জাবে আমার পুত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন। প্রেমানন্দ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় লক্ষ্মণ সত্বর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। আমি শুনিয়াছি, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখনও জীবিত আছে।”

রমণী এই পর্য্যন্ত বলিলে পর সত্যবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কয়টী সন্তান ছিল?”

রমণী বলিলেন “সে সকল কথা আর কাহারও নিকট বলিতে ইচ্ছা করি না। এইমাত্র বলিতেছি যে, দুরাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতারণা নিবন্ধন আমার স্বামী আত্মহত্যা করিলেন এবং অনাহারে আমার শিশু সন্তান দুইটীর মৃত্যু হইল।”

রামানন্দ গোস্বামী বলিলেন “মা! আপনার প্রসাদেই আমার প্রেমানন্দ এখনও জীবিত আছে। আপনি আমাদিগের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে, আমরা কি আর আপনার কোনও অনিষ্টের চেষ্টা করিব?”

রমণী। আপনারা যে আমার কোনও অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু প্রেমানন্দ আমাকে সম্প্রতি কাহারও নিকট আত্মবিবরণ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারি না, কিজন্য এখনও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আমাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় তিনি এই বিষয়ের কিছু জানিতে পারিয়াই আমাকে সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে বলিয়াছেন।

রামানন্দ। প্রেমানন্দকে এখন আবার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কিজন্য কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? আমার সমুদয় ব্রহ্মত্র জমিই আমি দশ বৎসর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছি। পৈতৃক ভদ্রাসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি।

রমণী। কিজন্য প্রেমানন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কিছুই জানি না। শুনিয়াছি, গৌরমোহন চৌধুরী নামক একজন দুষ্ট জমিদার তাঁহার সমুদয় অভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে।

রামানন্দ। দেবীসিংহের পূর্ণিয়ার কারাগার হইতে পলায়ন করিবার পর প্রেমানন্দ কতদিন দিনাজপুরে ছিল?

রমণী। পূর্ণিয়া হইতে পলায়ন পূর্ব্বক দিনাজপুর পৌঁছিয়াই আমি প্রেমানন্দকে তাঁহার পিতা এবং স্ত্রীর নিকট যাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি আমাকে বলিলেন “মা!

তোমার প্রসাদেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। তোমার পুত্রের অনুসন্ধান না করিয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।” বিশেষতঃ সেই সময় তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আপনারা নির্ব্বিঘ্নে রঙ্গপুরে কোনও এক শিষ্যালয়ে অবস্থান করিতেছেন, আপনাদের তখন অন্য কোনও বিপদাশঙ্কা ছিল না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু এগার বৎসর পর্য্যন্ত কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াও আমার পুত্রের কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না। ইঁহারা তখন একপ্রকার নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। কাশী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া এক মহাপুরুষের নিকট শুনিতে পাইলেন যে, আমার পুত্র পঞ্জাবে আছেন। তখন লক্ষ্মণ কাশী হইতে পুনর্ব্বার পঞ্জাবে যাত্রা করিলেন; প্রেমানন্দ আপন বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত স্বদেশে আসিলেন। কিন্তু রঙ্গপুরে যে শিষ্য-বাড়ী আপনি পুত্রবধূ সহ অবস্থান করিতেছিলেন, সে বাড়ীর আর চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। রঙ্গপুর হইতে যে আপনি তখন কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুন-র্ব্বার দিনাজপুর হইতে আমার নিকট আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং দেবীসিংহ আমাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাতে আমরা অত্যন্ত ভীত হইলাম। তখন প্রেমানন্দ রামসিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে লইয়া এই জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি দুইমাস পর্য্যন্ত এইখানেই আছি। কিন্তু প্রেমানন্দ মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের অনুসন্ধানে রঙ্গপুরে যাইতেন। সেই রঙ্গপুর হইতে তাঁহাকে দেবীসিংহের লোকেরা ধরিয়া নিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

রামানন্দ। রঙ্গপুরে দেবীসিংহের লোক যে তাহাকে ধৃত করিয়াছে, তাহা কাহার নিকট শুনিলেন?

রমণী। প্রেমানন্দের পরামর্শে রঙ্গপুরে সমুদয় অত্যাচারনিপীড়িত প্রজা সম্প্রতি দলবদ্ধ হইয়াছে। দেবীসিংহের লোকেরা তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া এখন তাহারা একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে, কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করিবে না। কোম্পানিকে এ দেশ হইতে

একেবারে তাড়াইয়া দিবে। প্রেমানন্দের দলস্থ সেই সকল লোক সর্ব্বদাই আমার এখানে আসিয়া আমার তত্ত্ব ও খবর লইয়া যায়। তাহারাই আমার আহারোপযোগী তণ্ডুলাদি দিয়া যায়। প্রেমানন্দ কলিকাতায় প্রেরিত হই-বার পূর্ব্বে, তাহাদিগকে আমার তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে। বোধ হয় প্রেমানন্দের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম বিফল হইবে। ৭ই মাঘের পূর্ব্বে প্রেমানন্দ সমুদয় বন্দো-বস্ত করিবেন বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। কিন্তু আজও তিনি যখন আসিতে পারিলেন না, ইহাতে বড়ই বিপদাশঙ্কা হইতেছে।

রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে জঙ্গলের মধ্য হইতে হঠাৎ পাঁচ জন লোক আসিয়া কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামানন্দ গোস্বামী এবং সত্যবতী ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "ভয় নাই। ইহারা প্রেমানন্দের অনুগত লোক। প্রেমানন্দের কি হইয়াছে, এখনই জানিতে পারিব।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

কলিকাতা যাত্রা।

নবাগত পাঁচ জন লোক কুটীরের দ্বারে আসিয়াই কুটীরবাসিনী রমণীর চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। রমণী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলি-লেন "ভগবান্ তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" এই পাঁচ জন লোকের মধ্যে এক জনের নাম দয়ারাম। ইহাকে কেহ কেহ দয়াশীল বলিয়া সম্বোধন করিত। অপর চারিজন এই রমণীর আহার্য্য জিনিষ মস্তকে বহন করিয়া দয়ারামের সঙ্গে আসিয়াছে।

দয়ারাম কুটীরবাসিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"মা!

আমরা এখন বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। প্রেমানন্দ ঠাকুর ধৃত হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি যেরূপে পারেন, জেল ভাঙ্গিয়া আসিয়াও, ৭ই মাঘের পূর্ব্বে রঙ্গপুরে পৌছিবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তিনি আসিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, একান্ত যদি ৭ই মাঘের পূর্ব্বে তিনি আসিতে না পারেন, তথাচ সেই দিবস আমাদিগকে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। তাঁহারই উপদেশানুসারে আমরা বিগত কল্য নুরাল মহম্মদকে নবাবের পদে বরণ করিয়া কোম্পানির প্যাদা এবং বরকন্দাজদিগকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা সেই বিশ্বাসঘাতক গৌরমোহন চৌধুরীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজিরহাটের লোকদিগকে ধৃত করিতে আরম্ভ করিল। এই উপলক্ষে আমাদিগের সহিত তাহাদের গত কল্য এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিপাহী, বরকন্দাজ, প্যাদা একজনও প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রেমানন্দ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, পলায়নপর লোকদিগকে কখনও প্রাণে বধ করিবে না। আমাদের পক্ষের লোকেরা প্রেমানন্দের সে উপদেশ বিস্মৃত হইয়া সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ কোম্পানির সমুদয় লোকের প্রাণবিনাশ করিয়াছে; এবং গৌরমোহন চৌধুরীকেও তাহাদিগের সঙ্গে হত্যা করিয়াছে। গৌরমোহনের বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধনই প্রেমানন্দ ঠাকুর ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং কেবল বৈরনির্য্যাতনের ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমাদের লোকেরা গৌরমোহনের প্রাণবধ করিয়াছে। আমার বোধ হয়, প্রেমানন্দ ঠাকুর সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে, তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়ম সকল কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে। তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মের পথ—সত্যের পথ পরিত্যাগ না করিলে কখনও আমরা পরাজিত হইব না। তাঁহার উপদেশ প্রতিপালনার্থ আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু বিপক্ষগণ যেরূপ বিশ্বাসঘাতক, তাহাতে আমাদের ভয় হয় যে, আত্মরক্ষার্থ আমাদিগকেও কখনও কখনও ন্যায়পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এইক্ষণে আমাদের আর কোনও উপদেষ্টা নাই। আপনাকে আমরা সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীস্বরূপ মনে করি। প্রেমানন্দের উদ্ধারের নিমিত্ত এখন কি করিতে হইবে, তাহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।”

দয়ারামের বাক্যাবসানে কুটীরবাসিনী বলিলেন "বাছা! যখন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তখন তোমাদের কাহারও এখন কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দের উদ্ধারার্থ স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে। তোমরা কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ কর। প্রেমানন্দের উদ্ধারার্থ যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা আমি নিজেই করিব। কোম্পানির দৌরাত্ম্যে একেই দেশ অরাজকতা-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার এই যুদ্ধোপলক্ষে নানাপ্রকার অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। বিপক্ষদল দেশীয় রমণীদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। প্রেমানন্দ তোমাদিগকে বারংবার বলিয়া গিয়াছেন—যুদ্ধকালে কি স্বপক্ষ, কি বিপক্ষ, কোনও পক্ষের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে। তোমরা তাঁহার এই উপদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না।"

দয়ারাম। আমরা প্রাণান্তেও তাঁহার সে উপদেশ অবহেলা করিব না। কিন্তু কোম্পানির সিপাহীগণ স্ত্রীলোকদিগের উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না; সুতরাং তাহাদিগের এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দর্শনে আমাদিগের লোকেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অনুকরণ করিতে পারে।

কুটীরবাসিনী। সৈনিক পুরুষগণ মধ্যে যাহারা নারীজাতির উপর অত্যাচার করে, তাহারা নিতান্তই কাপুরুষ। তাহারা কখনও বীর নামের উপযুক্ত নহে। তাহারা সত্য সত্যই আততায়ী।

দয়ারাম। আপনার এই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। গত কল্য যুদ্ধের পর আমি সায়ংকালে রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া আজ অপরাহ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমাকে কি এখনই রঙ্গপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন?

কুটীরবাসিনী। তুমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া সঙ্গী লোক সহ শীঘ্র অশ্বারোহণে রঙ্গপুর চলিয়া যাও। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে প্রেমানন্দ চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

দয়ারাম তৎক্ষণাৎ রমণীকে প্রণাম করিয়া রঙ্গপুর চলিল। সে চলিয়া গেলে পর কুটীরবাসিনী দেবী সত্যবতীকে বলিলেন "মা! আমি নিজেই প্রেমানন্দের উদ্ধারার্থ কলিকাতা যাইব। তোমরা এই স্থানে আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অবস্থান কর। কিন্তু আমার একটি বিষয়ে আশঙ্কা

হইতেছে, প্রেমানন্দ আমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কিছুই জানি না।"

সত্যবতী বলিলেন "মা! আপনাকে তিনি স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিয়া থাকিলে, আপনি এখানে থাকুন। আমি কলিকাতা যাইয়া তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

কুটীরবাসিনী। তাঁহার উদ্ধারার্থ কি উপায় অবলম্বন করিবে?

সত্যবতী। সেখানে যাইয়া অবস্থানুসারে যাহা ভাল বোধ করি।

কুটীরবাসিনী। তুমি কুলবধূ। তোমার পক্ষে এ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সত্যবতী। বিপদে পড়িয়া অনেকানেক দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিতে শিখিয়াছি। বিপদ্ এবং দুরবস্থা মানুষকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা প্রদান করে।

রামানন্দ গোস্বামী ইঁহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন—"বউমা যেরূপ সাহস প্রকাশ করিয়া আমাকে কারামুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয় তিনি নিশ্চয়ই বাছাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন। আমি আর অনেক দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাছাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

রামানন্দের কথা শেষ হইতে না হইতে রূপা আসিয়া ইঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। রূপা পূর্ব্বেই জানিত যে, ইঁহারা পাড়ুয়ার জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পলাইয়া থাকিবেন। রূপাকে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া ইঁহারা সকলেই যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর সত্যবতী জগাকে সঙ্গে করিয়া স্বামীর উদ্ধারার্থ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কুটীরবাসিনী রমণী রামানন্দের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

স্বপ্ন।

"Gangagovinda was considered as a general oppressor of every native he had to deal with. By Europeans he was detested, by natives he was dreaded."—*Evidence of Mr. Peter Moor in the trial of Hastings.*

এ সংসারে যাহারা অপরের অনিষ্ট করিয়া পদ প্রভুত্ব লাভ করে, সর্ব্বদা যাহারা স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করে না, এ জীবনে কখনও তাহাদের শান্তি নাই। চির অশান্তিই তাহাদের একমাত্র পুরস্কার। কিন্তু তাহারা সকলেই একবিধ অশান্তি ভোগ করে না। আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে এক এক জন এক এক প্রকারের অশান্তি ভোগ করে।

স্বার্থপরতা, অর্থলিপ্সা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি অন্যান্য রিপু যাহার হৃদয় একেবারে পাষাণ করিয়া তুলিয়াছে, যাহার অন্তরে দয়ার চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, দরিদ্রের আর্ত্তনাদ এবং ক্রন্দনধ্বনি যাহার কর্ণে কোনক্রমেই প্রবেশ করে না, আত্মসুখচিন্তা যাহার বিবেককে স্পন্দহীন করিয়াছে, এবং যশ ও প্রভুত্বলাভের অদম্য অভিলাষ যাহার চিন্তাশক্তিকে কেবল সেই দিকেই পরিচালন করিতেছে, নিরাশা এবং ভয়ই তাহার চির অশান্তির একমাত্র মূল কারণ।

পক্ষান্তরে যাহার বিবেক এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে স্পন্দহীন হয় নাই, দয়া স্নেহ মমতা এখন বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় যাহার হৃদয় মধ্যে অন্ততঃ পলকের নিমিত্তও কখন কখন সমুদিত হয়, পরমেশ্বর তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে তাহার হৃদয় মধ্যে অনুতাপানল প্রজ্বলিত করিয়া, তাহাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ প্রদান করেন।

দেবীসিংহের হৃদয় একেবারে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছে; তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইয়া ছারখার হইয়াছে; দয়া, মমতা, এবং স্নেহের আলোক তাহার সেই অন্ধকূপসদৃশ হৃদয় মধ্যে কখনও প্রবেশ করিতে পারে না;

কোনও কুকার্য্য, কোনপ্রকার অসদাচরণ তাহার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্বলিত করিতে পারে না।

কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেবীসিংহের ন্যায় একেবারে মনুষ্যত্ববিহীন নহেন। স্বার্থপরতা এবং অর্থলিপ্সা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিচারশক্তিকে স্পন্দ-হীন করে নাই। এড্‌মাণ্ড্ বার্ক্ প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় সহৃদয় মহাত্মগণ, দেবীসিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উভয়কে সমান নরপিশাচ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের অন্তরে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায়, সময় সময় দয়া, স্নেহ এবং মমতার শেষ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত।

দিবসে গঙ্গাগোবিন্দ সর্ব্বদাই রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। দেশের সমুদয় রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। সুতরাং দিবসের মধ্যে অন্য কোনও বিষয় চিন্তা করিবার এক মুহূর্ত্তও তাঁহার অবকাশ ছিল না। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই এক ভয়ানক স্বপ্ন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিত। স্বপ্নাবস্থায় তিনি কোনও কোনও রাত্রে চীৎকার করিয়া উঠিতেন।

প্রায় বার তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাত্রেই তিনি স্বপ্নে দেখিতেন—"সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে একটি পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা দুই কক্ষে দুইটি মৃত সন্তান লইয়া তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণী নিকটে আসিয়াই মৃত সন্তানদ্বয়কে তাঁহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া দিতেছেন। আবার পশ্চাৎ হইতে একজন ব্রাহ্মণ আপন গলার পৈতা খুলিয়া সেই পৈতা তাঁহার গলদেশে জড়াইতেছেন; এবং বারংবার সক্রোধে বলিতেছেন "তোর প্রতারণায় আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলাম। আজ তোকেও উদ্বন্ধনে মরিতে হইবে।"

পৈতা গলদেশে জড়িত হইবামাত্র কণ্ঠাবরোধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত; তখন তিনি স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। তাঁহার চীৎকারে সময় সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণীরও নিদ্রাভঙ্গ হইত।

গঙ্গাগোবিন্দের সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত পতিপ্রাণা এবং পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি স্বামীর মুখে এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। ঈদৃশ স্বপ্ন সম্বন্ধে হিন্দুরমণীদিগের তৎকাল-প্রচলিত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তিনি একদিন কাতরকণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন—

"নাথ! তোমার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে স্বপ্নস্বরূপ এই কঠিন

রোগ হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারিবে না। অতএব যে ব্রাহ্মণকন্যাকে তুমি স্বপ্নে দেখিতে পাও, তাহার অনুসন্ধান কর। যে পরিমাণ ভূমি হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার শতগুণ ভূমি তাঁহাকে দান করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ কর। তোমার মঙ্গলার্থ আমি কিছুকাল তাঁহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া প্রত্যহ তাঁহার চরণ অর্চ্চনা করিব;—তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।"

গঙ্গাগোবিন্দ, দেবীসিংহের ন্যায় একেবারে পাষণ্ড ছিলেন না। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়াই স্থির করিলেন। স্বপ্নে যে ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিতেন, তাঁহাকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত লোক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে, সে ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষিপ্তাবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেন; কয়েক মাস হইল রাজা দেবীসিংহ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ তখন এই ব্রাহ্মণকন্যাকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত দেবীসিংহকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ মুর্শিদাবাদে একজন কানুনগু ছিলেন। তাঁহার তখন কোনও বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না। দেবীসিংহ তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে দেবীসিংহের সহিত গঙ্গাগোবিন্দের প্রথম শত্রুতা হয়।

দেবীসিংহ পূর্ব্বেও মনে করিতেন এবং এখনও মনে করেন, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই ব্রাহ্মণকন্যাকে উপপত্নী করিবার নিমিত্ত তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। তবে দেবীসিংহের ন্যায় যাহার অন্তরাত্মা নরকসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে, সে মানুষের কোনও কার্য্যের মধ্যেই সদুদ্দেশ্য দেখিতে পায় না।

গঙ্গাগোবিন্দ শত চেষ্টা করিয়াও সে ব্রাহ্মণকন্যাকে আনাইতে পারিলেন না। কিন্তু বার বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইতেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

এই তো বিপ্লবের ফল !

"রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্ল্লভ দুর্ব্বল,
বাঙ্গালিকুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক,
ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল,
তোর পাপে বাঙ্গালীর ঘটিবে নরক।"—নবীনচন্দ্র সেন।

এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত গঙ্গাগোবিন্দের স্বপ্নবিবরণ পাঠ করিয়া, পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ কুটীরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাকেই স্বপ্নে দেখিতেন। কিন্তু এই কুটীরবাসিনী রমণী কে, এবং কি প্রকারে ইঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিতে হইলে অগ্রে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। অতএব এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমরা সেই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ এবং তোডরমল্ল প্রভৃতি সহৃদয় সুবাদারগণ, আপন আপন শাসনকালে, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেকানেক ভূমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে নিষ্কর ব্রহ্মত্রস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভিন্ন অন্যান্য সদ্‌গুণবিশিষ্ট এবং সচ্চরিত্র লোকদিগকেও কখনও কোনও সম্মানসূচক উপাধি প্রদানকালে অনেক ভূমি দান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে যদ্রূপ কোনও রেল্‌ওয়ে কণ্ট্রাক্টর কিংবা দুই একটা পবলিক্ ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ওভারসিয়ার, গবর্ণমেণ্টের দুই তিন লক্ষ টাকা চুরি করিয়া, তাহা হইতে দশ হাজার টাকা আবার কোনও এক কমিসনরের অনুরোধে সাধারণের হিতকর কার্য্যে দান করিলেই, একটা ফাঁকা রায়বাহাদুর কিংবা একটা সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল না। হিন্দু কিংবা মুসলমান রাজগণ কোনও ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান উপলক্ষে প্রায়ই ভূমিদান করিতেন। কখনও কখনও অন্য কোনও মূল্যবান্ জিনিস বিনামূল্যে প্রদান করিতেন। নজরস্বরূপ সে জিনিসের কোনও মূল্য গ্রহণ করিতেন না। এই-

প্রকার ভূমিদানপ্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, বঙ্গের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভূমি দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং অন্যান্য সচ্চরিত্র লোকেরা নিষ্কর ভোগ করিতেন। বঙ্গের মুসলমান সুবাদারদিগের মধ্যে যে দুই এক জন নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও এই সকল নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত করিবার নিমিত্ত, কিংবা আইনের ছলনা (legal fiction) করিয়া সেই সকল নিষ্কর জমির উপর কোনও নূতন কর স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির পর লর্ড ক্লাইব প্রভৃতির অর্থগৃধ্নুতা নিবন্ধন মুর্শিদাবাদের রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। তখন দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি না করিলে আর ব্যয়নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং মীর জাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর হইতেই দেশীয় জমিদারদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হইল। ইহার পর মীর কাসিম সিংহাসন লাভ করিবার নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে অনেক উৎকোচ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং সেই উৎকোচের টাকা দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইল। ১৫৮২ সালে মহারাজ তোডরমল্লের আমলে বঙ্গের ভূমির বার্ষিক রাজস্ব এক কোটি সাত লক্ষ টাকা ছিল। ইহার পর ১৭৫৬ সালে সিরাজের রাজত্ব পর্য্যন্ত ভূমির রাজস্ব এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষের অধিক কখনও হয় নাই। কিন্তু মীর কাসিমের সময় (১৭৬৩ সালে) দুই কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব ধার্য্য হইল। তৎপরে ক্রমেই ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মহম্মদ রেজাখাঁর সময় হইতে বঙ্গের নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতির পর, যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন বঙ্গদেশে নিষ্কর জমি ভোগ কবিবার যে কাহারও অধিকার আছে, তাহাও তিনি কার্য্যতঃ কখনও স্বীকার করিলেন না। তিনি জমিদার, তালুকদারদিগকে উৎখাত করিয়া তাঁহাদিগের পৈতৃক জমি নীচবংশোদ্ভব কলিকাতাস্থ বেনিয়ানের নিকট ইজারা দিতে লাগিলেন। ইজারাদারগণ যথাসাধ্য জমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সিরাজের সিংহাসনচ্যুতি নিবন্ধন রাজ্যবিপ্লব উপলক্ষে দেশের ভূমি-বিভাগ এবং ভূমি-বিধান সম্বন্ধে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে দুই একটি খাস মহালের ডেপুটী কলেক্টরের ন্যায় মহম্মদ

রেজাখাঁ ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রসন্নতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে, নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গের রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রেজাখাঁর অধীনেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কোনও এক পরগণার কাননগুর কার্য্য করিতেন। কিন্তু এই সময়ে যে সকল কাননগু আপন আপন রেজেষ্টরি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পরগণার ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত করিবার সুবিধা করিয়া দিতেন, তাঁহারাই মহম্মদ রেজাখাঁ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। রাধাগোবিন্দ সিংহ একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং রেজাখাঁ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তাঁহার ন্যায় সৎ লোকের চাকরি করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সুচতুর এবং কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাননগুর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দুই এক মাসের মধ্যেই অনেকানেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত করিবার সুবিধা করিয়া দিলেন।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোনও একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য নামে একটি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম কমলাদেবী। কমলাদেবী দেখিতে যদ্রূপ রূপবতী ছিলেন, তাঁহার চরিত্রও তদনুরূপই ছিল। শান্ত-সুশীলা কমলাদেবীকে বিষ্ণুর কমলার ন্যায় পরমা সাধ্বী এবং সদাচারিণী মনে করিয়া গ্রামের সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। যিনি তাঁহাকে একবার দেখিতেন, তিনি তাঁহার সেই স্নেহময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি কখনও ভুলিতে পারিতেন না। কমলাদেবীর গর্ভে জগন্নাথের তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই বালকত্রয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইত।

শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য স্ত্রীপুত্র সহ পরম সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার সাংসারিক কোনও কষ্ট ছিল না। পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমির উপস্বত্ব দ্বারা তিনি সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও কোনও শূদ্রাদির দান গ্রহণ করিতেন না।

কিন্তু দৈবদুর্বিপাক বশতঃ গঙ্গাগোবিন্দের চক্রান্তে মহম্মদ রেজাখাঁর আমলে জগন্নাথের সমুদয় ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইল। মহারাজ মানসিংহ

জগন্নাথের পূর্ব্বপুরুষকে এই জমি মুখে মুখে দান করিয়াছিলেন। ইহার কোনও দলিল পত্র ছিল না। অন্যূন তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ-পরম্পরায় জগন্নাথ এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এই জমি ভোগ করিতেছিলেন। 'কাননগুর রেজেষ্টরিই এই ব্রহ্মত্রের একমাত্র প্রমাণ ছিল। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের রেজেষ্টরিতে এই ব্রহ্মত্র জমির কোনও উল্লেখ ছিল না। সুতরাং মহম্মদ রেজাখাঁর সময় জগন্নাথের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত হইল।

জগন্নাথ মনে করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের চক্রান্তই তাঁহার এই বিপদের মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গাগোবিন্দকে অভিসম্পাত করিতেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালনের আর কোনও উপায় ছিল না। তাঁহার ব্রহ্মত্র জমি খাস হইলে পরও তাঁহার পুরাতন প্রজাগণ দুই তিন মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকেই খাজনা দিতে লাগিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই এই জমি কাসিমবাজারের বাবার (Baber) সাহেবের বেনিয়ান ইজারা লইল। এই নূতন ইজারাদার প্রজাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তখন প্রজাদিগের আত্মরক্ষা করাই দুষ্কর হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহারা আর জগন্নাথের কোনপ্রকার সাহায্য করিতে সমর্থ হইল না।

বৎসরেক পর্য্যন্ত জগন্নাথ অতি কষ্টে আপন গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর অত্যন্ত কষ্টে পড়িলেন। বিশেষতঃ সেই বৎসর (১৭৬৯ সালে) দেশে অত্যল্প শস্য হইয়াছিল। চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। জগন্নাথ আর কোনও ক্রমেই আহারের সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন স্ত্রীপুত্র সহ অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কমলাদেবী পৈতার সূতা কাটিয়া, এবং বাড়ীর আম কাঁটাল ও অন্যান্য ফল বিক্রয় করিয়া, যে দুই এক পয়সা পাইতেন, তদ্দ্বারা দুই এক দিন সন্তানদিগের আহারের সংস্থান করিতেন। এই ঘোর বিপদ্ ক্রমে জগন্নাথকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি সর্ব্বদাই স্ত্রীর নিকট বলিতেন "আমি দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইয়া আপন ব্রহ্মত্র বহাল করাইয়া আনিব—আমার সাত পুরুষের ব্রহ্মত্র হইতে কি আমাকে বেদখল করিবে?"

জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথের বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় বার বৎসর হইয়াছিল। সে প্রতিদিন পিতার মুখে দিল্লীর বাদসাহের নাম শুনিয়া এক দিন বলিল "বাবা, তুমি বাড়ী থাক। তুমি চলিয়া গেলে মাকে কে

কাঠ আনিয়া দিবে? কে বাজারে আম বিক্রী করিবে? আমি দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইব।"

পুত্রের মুখে জগন্নাথ এই কথা শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সন্তানদিগের দুরবস্থাদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ছোট পুত্র দুইটীর শীত নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র ক্রয় করিবার সাধ্য নাই। প্রাতে শিশু সন্তান দুটীকে বুকের মধ্যে রাখিয়া তাহাদের শীত নিবারণ করিতে হইত। কমলাদেবী একখানি জীর্ণ নেকড়া দ্বারা হাঁটু হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত থাকিত। সুতরাং এখন আর তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইবার সাধ্য নাই। এইরূপ জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া রমণীগণ স্বামী এবং সন্তান ভিন্ন অপর কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন না।

* * *

দিন দিন জগন্নাথের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একবার তিন দিনের মধ্যেও এক মুষ্টি সংস্থান করিতে পারিলেন না। তিন দিন ধরিয়া তাঁহার পুত্রত্রয় এবং স্ত্রী বৃক্ষের পাতা এবং কচুর মুল সিদ্ধ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীপুত্রের এ দুঃখ যন্ত্রণা জগন্নাথের আর সহ্য হইল না। তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। কমলা দেবী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অভিপ্রেত কুকার্য্য হইতে কিছুতেই বিরত হইলেন না। রাত্রে গোপনে গৃহের বাহিরে আসিয়া একটা আম্র বৃক্ষের ডালে রজ্জু বাঁধিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

স্বামিবিয়োগে কমলাদেবী একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। এখন আর তাঁহার দুঃখের পরিসীমা নাই।

জগন্নাথের মৃত্যুর দুই দিন পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথ জননীর নিকট আসিয়া বলিল "মা! বাবা বলিতেন, দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইতে পারিলে, আমাদের ব্রহ্মত্র খালাস করিয়া আনিতে পারিব, তবে আমি এখন দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাই। তুমি বাড়ী থাকিয়া ইহাদের (ছোট দুইটী পুত্রের) প্রতিপালন করিতে চেষ্টা কর।"

পুত্রের কথা শুনিয়া কমলাদেবী সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন "বাছা! তুমি বার বৎসরের বালক। তুমি কি প্রকারে একাকী দিল্লী যাইবে?

আমার এ প্রাণ থাকিতে কি আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারি? যাহা পরমেশ্বর অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। কিন্তু আমি তোমাকে এই সময় আমার কাছ ছাড়া হইতে দিব না।”

কিন্তু বালক কিছুতেই মাতার কথায় সম্মত হইল না। সে রাত্রে পলায়ন পূর্ব্বক বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

কমলাদেবীর এখন বিপদের উপর বিপদ্; দুঃখের উপর দুঃখ; শোকের উপর শোক। দারিদ্র্য নিবন্ধন যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছেন। সন্তানের মুখে দুইটি অন্ন প্রদান করিবার সাধ্য নাই। এই দুঃখের উপর আবার স্বামিবিয়োগ, পুত্রের দেশত্যাগ; মানুষ কি কখনও এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে? তিনিও অনায়াসে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা, সকল কষ্ট দূর করিতে পারিতেন; কিন্তু অপত্যস্নেহ তাঁহাকে সে পথ অবলম্বন করিতে দিল না।

হায়! মাতৃস্নেহ কি অমূল্য ধন, কি স্বর্গীয় পদার্থ! মাতা কেবল সন্তান দুইটির নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ধন্য নারীজাতির ধৈর্য্য! ধন্য ইঁহাদিগের সহিষ্ণুতা!

* * * * *

কমলাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহত্যাগের চারিদিন পরে অনাহারে তাঁহার শিশু সন্তান দুইটির মৃত্যু হইল। তখন শোক ও দুঃখে তিনি একেবারে পাগল হইয়া পড়িলেন। মৃত সন্তানদ্বয়কে কক্ষে করিয়া এবং একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সঙ্গে লইয়া, গঙ্গাগোবিন্দের প্রাণসংহারার্থে তাঁহার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের সহরের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে গঙ্গাগোবিন্দ তখন সময় সময় অবস্থান করিতেন। কমলাদেবী তাঁহার সেই গৃহে পৌঁছিয়া গঙ্গাগোবিন্দকে দেখিবামাত্র তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বসাইবার পূর্ব্বেই, অন্যান্য লোক তাঁহাকে ধৃত করিল এবং পাগলিনী মনে করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তাড়িত হইবার সময় কমলাদেবী ক্ষিপ্তের ন্যায় বক্‌বক্ করিয়া যখন পতির ব্রহ্মত্রের বিষয় এবং নিজের দুরবস্থার কথা বলিলেন, তখন গঙ্গাগোবিন্দ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই রমণী জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। তখন গঙ্গাগোবিন্দের হৃদয় বৃশ্চিকে দংশন করিল। এই সকল ব্যাপার স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই গঙ্গাগোবিন্দের আত্মসংশোধনের প্রথম সুযোগ। যদি এই মুহূর্ত্তে তিনি আর অপরের অনিষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন, অন্তরস্থিত অদম্য পদ প্রভুত্বের লিপ্সা পরিত্যাগ করিতেন, তবে এ জীবনে নিশীথে সুখে নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইতেন। কমলাদেবীর ছায়া প্রত্যেক রজনীতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিত না। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া মনুষ্য এই সকল ঈশ্বরপ্রদত্ত সুযোগ অবহেলা করে, এবং পদ প্রভুত্বের মধ্যেই কেবল সুখান্বেষণ করিতে থাকে।

কমলাদেবী গঙ্গাগোবিন্দের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ক্ষিপ্তাবস্থায় মুর্শিদাবাদের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রকাশ্য রাস্তায় পাগলিনীর ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার একজন প্রতিবেশী তাঁহার মৃত সন্তানদ্বয়ের শব তাঁহার কক্ষ হইতে সজোরে কাড়িয়া নিয়া দাহ করিলেন।

কিছুকাল পরে দেবীসিংহ একদিন মুর্শিদাবাদের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোনও প্রকাশ্য রাস্তায় কমলাদেবীকে দেখিতে পাইয়া আপন লোকদিগকে ইহাকে ধৃত করিতে বলিলেন। কমলাদেবী অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় যখন তিনি রাস্তায় বিচরণ করিতেন, তখনও তাঁহার রূপ দেখিয়া লোক মোহিত হইত।

দুরাত্মা দেবীসিংহ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এই পাগলিনী অত্যন্ত রূপবতী। ইহার ক্ষিপ্তাবস্থা একটু দূর হইলে, ইহাকে কোনও একটা সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে পারিলে, অনায়াসে তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ সাহেবেরা কিছু এ দেশের ভাষা জানেন না। পাগলিনীর কোনও কথা এবং ভাব ভঙ্গী তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। ইঁহাকে ক্ষিপ্তাবস্থায় কোনও সাহেব সুবার নিকটে প্রেরণ করিলেও তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নরপিশাচ দেবীসিংহ পরমা সাধ্বী কমলাদেবীকে তাহার স্ত্রী-খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ইহার পর কমলাদেবী লক্ষ্মণ সিংহের সাহায্যে যেরূপ দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। সে সকল বিবরণ এখানে আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কমলাদেবী দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড়ে অবস্থানকালে কখনও কখনও অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে করিতেন। এক একবার দুই তিন দিনের মধ্যেও আহার করিতেন না। কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের

স্নেহানুরোধে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই আশায় কেবল জীবনধারণ করিতেছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনুসন্ধান।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কমলাদেবী লক্ষ্মণ সিংহের সাহায্যে দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড় হইতে মুক্ত হইয়া রাম সিংহের বাড়ী আসিলে পর, লক্ষ্মণ সিংহও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুর আসিলেন; এবং কমলাদেবীকে মাতৃদেবী জ্ঞানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী ভগবতীর ন্যায় সস্ত্রীক সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কমলাদেবী স্বামি-পুত্র-শোকে সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন; লক্ষ্মণ শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সুখী করিতে সমর্থ হইলেন না। লক্ষ্মণ আপনার ধন, সম্পত্তি, হৃদয়, মন সকলই কমলাদেবীর চরণে সমর্পণ করিলেন। কিরূপে কমলাদেবীকে সন্তুষ্ট করিবেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র ধ্যান, একমাত্র চিন্তা হইল। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড-স্বরূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জীবনবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু কমলাদেবীকে শোকার্ত্ত করিবে, কমলাদেবীর অন্তরে কষ্ট প্রদান করিবে, সেই জন্যই সে পথ অবলম্বন করিলেন না। শুদ্ধ কেবল কমলাদেবীর সুখ শান্তি পরিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত তিনি এখন জীবনধারণ করিতেছেন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কমলাদেবীকে বিমর্ষ দেখিলে যে, তিনি যার-পর-নাই কষ্টানুভব করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

পাঠকগণের জ্ঞাত করণার্থে আমরা এই স্থানে লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান করিতেছি। রামসিংহ এবং লক্ষ্মণসিংহ ইঁহারা দুই ভাই সুবেদার ফতেসিংহের পুত্র। ফতেসিংহের পিতা দিনাজপুরের রাজার অধীনে চাকরি করিতেন। ফতেসিংহ নিজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক দলে সুবেদারের পদ প্রাপ্ত হইয়া রোহিলা-যুদ্ধের সময়, জেনেরল চ্যাম্পানের অধীনে, অযোধ্যার

উজির সুজা উদ্দৌলার পক্ষে রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রোহিলাধিপতি বীরকুলতিলক হাফেজ রহমত খাঁ স্বদেশ রক্ষার্থ রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলে পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ রোহিলাদিগের গৃহের মূল্যবান্ সমুদয় জিনিস পত্র লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং রোহিলা রমণীদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করিল।

ফতেসিংহ এই সকল ইংরাজ সৈন্যদিগের নিষ্ঠুরাচরণ এবং পশুবৎ ব্যবহার দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া জেনেরল চ্যাম্পানকে বলিলেন—"আয়ে জেনেরল্ চ্যাম্পান! আপ্‌কা ফৌজ্‌কা আদ্‌মি ছব্ ছিপাহি হায়—ইয়া চোর হায়—ইয়া ছালে লোক ছব্ আওরাৎ কো বি বিইজ্জাত কিয়া—আউর আদমিওকো ঘরকা চিজ্ ছব্ চুরি কিয়া।"

জেনেরল চ্যাম্পান বলিলেন যে, তিনি ইংরাজ সৈন্যদিগের এই দুর্ব্যবহার নিবারণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সৈন্যদিগের দুর্ব্যবহার নিবারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতে তাঁহার কোনও সাধ্য নাই।

ফতেসিংহ জেনেরল চ্যাম্পানের এই কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"হাম্ চোরকা নকৃরী নেই করেগা—জেনেরল ছাবু, আবি হামারা এস্তফা লি জিয়ে।"

এই বলিয়া ফতেসিংহ চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র রামসিংহ এবং লক্ষ্মণসিংহও প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সিপাহী ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৯ সালের পূর্ব্বে তাঁহারা সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া রাজস্ববিভাগের জমাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ ১৭৭১ সালেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। রামসিংহ এখন পর্য্যন্তও (অর্থাৎ ১৭৮৩ সাল পর্য্যন্ত) কলেক্টরের জমাদারের পদে নিযুক্ত আছেন।

লক্ষ্মণ কমলাদেবীর সমুদয় দুঃখের কারণ অবগত হইবার পর অবিলম্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দও লক্ষ্মণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইঁহারা দুই জনে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পাটনা, গয়া, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, অযোধ্যা এবং তৎপরে দিল্লী পর্য্যন্ত ইঁহারা কমলাদেবীর পুত্র ক্ষেত্রনাথের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন।

একাদিক্রমে অন্যূন এগার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার কোনও সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে লক্ষ্মণ প্রেমানন্দকে বলিলেন—

"ভাই, তুমি স্বদেশে চলিয়া যাও। আমি আর দেশে যাইব না। কমলাদেবীকে আমি আপন জননী বলিয়া মনে করি। যে স্নেহময়ী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম, কমলাদেবীকেও সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। বাল্যকালে আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে কোনও প্রকারে সুখী করা আমার অদৃষ্টে ছিল না। এখন মাতৃসদৃশী কমলাদেবীকে সুখী করিতে না পারিলে আমার জীবন বৃথা। অতএব আমি আর তাঁহাকে মুখ দেখাইব না। কাশীতে যাইয়া মহাদেবের মন্দিরদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িব। ক্ষেত্রনাথ কোথায় আছেন, তৎসম্বন্ধে স্বপ্নাদেশ না হইলে, শিবের দ্বারে এই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

এইপ্রকার স্থির করিয়া লক্ষ্মণ প্রেমানন্দকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে লক্ষ্মণের পিতা ফতেসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফতেসিংহ লক্ষ্মণের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

"বাছা! এখানে একজন পরমহংস আছেন। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় গণনা করিয়া বলিতে পারেন। তোমার ধরণা দিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে সেই পরমহংসের নিকট লইয়া যাইব। কমলাদেবীর পুত্র জীবিত আছেন কি না, এবং জীবিত থাকিলে কোথায় আছেন, তাহা পরমহংস নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন।"

লক্ষ্মণ তখন স্বীয় পিতার সঙ্গে একত্র হইয়া পরমহংসের নিকটে যাইয়া আত্মবিবরণ বিবৃত করিলেন। পরমহংস লক্ষ্মণের সমুদয় কথা শ্রবণান্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"বাছা! যে ব্রাহ্মণকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার বিষয় কিছু গণনা করিয়া বলিতে হইবে না। সে বালক অনেক দিন আমার আশ্রমে ছিল। তাহার সমুদয় অবস্থাই আমি জ্ঞাত আছি। সে এখন পঞ্জাবে আছে।"

পরমহংসের কথার উপর লক্ষ্মণ বড় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষেত্রনাথের বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

পরমহংস তখন ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন "বাছা! এখন দেশের রাজা ম্লেচ্ছ। লোকের কথায় লোক বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। রাজা অর্থগৃধ্নু হইলেই লোকের মনের অবস্থা এইরূপ হয়। সে বালকের বিষয় আমি যাহা যাহা জানি, তৎসমুদয়ই বলিতেছি। সমুদয় কথা শুনিলে তোমার অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকিবে না।

"আমি বিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই কাশীধামে বাস করিতেছি। বোধ হয় আজ প্রায় দশ বার বৎসর হইল (অর্থাৎ যে বৎসর বঙ্গদেশে বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার পূর্ব্ব বৎসর) বার তের বৎসরবয়স্ক একটি বালক মণি-কর্ণিকার ঘাটে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আমি গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়াই, ঐ বালকটীকে দেখিতে পাইলাম। তাহার জীবন-বায়ু তখন পর্য্যন্তও নিঃশেষ হয় নাই। বালকটি সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্ট। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি কোনও সাধ্বীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং মর্ত্তলোকে আসিয়া তাঁহার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। বাছা! তোমার নিকট অধিক কি বলিব, এমন সুন্দর বালক আমি আর কোথাও দেখি নাই। বালকটিকে এইরূপ মৃত-কল্লাবস্থ দেখিয়া আমি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আপন আশ্রমে আনিলাম। আমার শিষ্যগণ ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিয়া পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাহাকে একটু সুস্থ করিল।

"বালক চেতনা লাভ করিয়া কেবলই বলিতে লাগিল—'আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইব—আমাদের ব্রহ্মত্র জমি খালাস করিয়া আনিব—আমার মা এবং ভাই দুইটি অনাহারে মরিতেছে।'

"আমরা তখন বালকের এই সকল কথার কোনও অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। প্রায় পনের দিন পরে সে একেবারে আরোগ্য লাভ করিল। তখন সে আমা-দিগের নিকট বলিল যে, কোম্পানির লোকেরা অনেকানেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র জমি খাস করিয়াছে। তাহাতে কত শত ব্রাহ্মণ সপরিবারে অন্নাভাবে একেবারে মারা পড়িতেছে। তাহার পিতার ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইলে পর তিনি নিরন্ন হইয়া পড়িলেন। তৎপরে স্ত্রীপুত্রের দুঃখ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আর তাহার মাতা এবং ছোট দুইটি ভাই অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া বাড়ীতে আছেন। সে তখন

ব্রহ্মত্র জমি খালাস করিয়া আনিবার নিমিত্ত দিল্লীর বাদসাহের নিকট চলিয়াছে।

"বাছা! বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। কিন্তু তাহার সাহস ও সহৃদয়তা দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম "বাছা! তুমি নিতান্ত বালক। তুমি তো কখনও দিল্লীর সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ এখন সম্রাটের কোন ক্ষমতা নাই। বঙ্গদেশ সম্রাট্ কোম্পানিকে দিয়াছেন। আর সম্রাটের ক্ষমতা থাকিলেও কি তিনি তোমার কোনও নালিশ শুনিতেন? কি তোমাকে কোন প্রতিকার প্রদান করিতেন? তুমি দেশ ছাড়িয়া বড় নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। এখানে আমার পরিচিত অনেক ধনী লোক আছেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া তোমাকে দিব। তুমি সেই টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও। কিন্তু সাবধানে চলিয়া যাইবে। তোমার ন্যায় বালক টাকা সঙ্গে করিয়া চলিলে রাস্তায় অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে।

"বালক আমার কথা শুনিয়া কিছুকাল আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া বলিল 'কেন দিল্লীর বাদসাহ আমাদের সাত পুরুষের ব্রহ্মত্র জমি ছাড়িয়া দিবেন না?'

"বালকটির বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে। যখন তাহাকে বুঝাইয়া আমি সকল কথা বলিলাম, তখন সে আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইল। আমি এই স্থানে দশ পাঁচজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে দশটী স্বর্ণ মোহর এবং পঞ্চাশটী রোপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দিলাম। আমার শিষ্যেরা সেই টাকা এবং মোহর তাহার কটিদেশে বাঁধিয়া দিল। সে স্বদেশে চলিয়া গেল।

"কিন্তু কয়েক মাস পরে সে আবার বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিল; এবং আমার প্রদত্ত সমুদয় টাকা ও মোহর আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—'ঠাকুর, আমার টাকায় আর কোনও প্রয়োজন নাই। আমি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিব।'"

"আমি তাহাকে পুনর্ব্বার এত শীঘ্র এখানে আসিতে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাহার শারীরিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার শরীরে কোনও রোগ দেখা

গেল না। কিন্তু তাহার সেই সমুজ্জ্বল বর্ণ একেবারে বিবর্ণ এবং শরীর অস্থি-চর্ম্মসার হইয়াছিল।

"আমি বারংবার তাহার বর্ত্তমান দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে আপন মনের ভাব কিছুতেই ব্যক্ত করিল না। আমি তাহাকে তাহার ছোট ভাই দুইটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল 'তাহাদের দুইটিরই মৃত্যু হইয়াছে।' পরে তাহার জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু সে কোনও প্রত্যুত্তর করিল না। তখন আমার সন্দেহ হইল যে, ইহার জননীর সম্বন্ধে ইহার কোনও কুসংস্কার হইয়া থাকিবে; তজ্জন্যই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

"এই বালকটির প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাহাতেই ইহার সকল কথা শুনিবার নিমিত্ত বড় কৌতূহল হইল। আমি বারংবার তাহাকে বলিতে লাগিলাম—'তোমার সকল দুঃখের কথা আমার নিকট বল, আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।'

"বালক বলিল যে, তাহার দুঃখ দূর করিতে পারে এমন সাধ্য সংসারে কাহারও নাই। একমাত্র মৃত্যুই কেবল তাহার দুঃখ দূর করিবে।

"আমি আবার তাহাকে বলিলাম 'তোমার কিছু ভয় নাই। আমি তোমার কোনও গুপ্তকথা প্রকাশ করিব না। তোমার বর্ত্তমান দুঃখের কথা আমার নিকট বল।'

"অবশেষে বালক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল 'ঠাকুর! মাতৃ-কলঙ্ক কি কেহ মুখে আনিতে পারে?' এই বলিবা মাত্র উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

"কিছুকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া সে আবার ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তখন আর তাহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু পর দিন প্রাতে আবার গোপনে তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম 'বাছা! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সকল কথা আমার নিকট বল। তোমার এই সম্বন্ধে কোনও ভ্রম হইয়া থাকিলে আমি সে ভ্রম সংশোধন করিতে পারিব।' বালকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, সে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার পৈতৃক বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাড়ী-ঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। একজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিয়াছে, তাহার বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার তিন চারি দিন পরেই তাহার ছোট ভাই দুইটির মৃত্যু হইয়াছিল।

তাহার জননী তৎপরে দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

"বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন—এই কথাটি বলিবার সময় বালকটির তিনবার কণ্ঠরোধ হইল। সে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার এই সকল কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বড়ই কষ্টানুভব করিতে লাগিলাম। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে বলিলাম 'বাছা! তোমার জননীর চরিত্র সম্বন্ধে তোমার বৃথা কুসংস্কার জন্মিয়াছে। আমার বোধ হয় না যে, তোমার ন্যায় সুসন্তান যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কখনও এই-প্রকার কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।'

"কিন্তু বালক আমার কথার উপর বিশ্বাস করিল না। সে আত্ম-হত্যা করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাকে আত্মহত্যা হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত আমি আবার তাহাকে বলিলাম 'বাছা! আমি ফল দেখিয়া বৃক্ষের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। মানুষ দুই প্রকারে সাধুজীবন লাভ করিতে পারে। কেহ কেহ পিতা মাতা হইতেই সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সচ্চরিত্র হয়। আর কেহ কেহ সৎশিক্ষা দ্বারা সচ্চরিত্র লাভ করে। কেবল সৎশিক্ষা দ্বারা যাহারা সচ্চরিত্র লাভ করে, তাহাদিগকে আপন আপন প্রকৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হয়। তাহাদের ইচ্ছা, বাসনা সর্ব্বদাই অসৎ পথে ধাবিত হয়। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা তাহারা সেই সকল অদম্য বাসনাকে পরাস্ত করে। পক্ষান্তরে যাহারা পিতা মাতা হইতে সৎপ্রকৃতি লাভ করে, তাহারা বাল্যকাল হইতে আপন প্রকৃতি অনুসারে সৎপথে পরিচালিত হয়। তুমি তের বৎসরের বালক। তোমার মধ্যে আমি যে সকল সাধুভাব দেখিতে পাই, তাহা কিছু শাস্ত্রশিক্ষার ফল নহে। তুমি এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু শিক্ষালাভ কর নাই যে, কুপথগামী ইচ্ছাকে এবং অদম্য বাসনাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং তোমার হৃদয়ের এই সকল সাধুভাব যে জননীর প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছ, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। পাপের প্রতি, মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রতি, তোমার জননীর বিশেষ ঘৃণা না থাকিলে, এত অল্প বয়সে তুমি এইরূপ পবিত্র জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইতে না। তোমার জননী নিশ্চয়ই পরমা সাধ্বী। তিনি কখনও কুপথগামিনী হয়েন নাই। তুমি নিতান্ত ভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছ।'

"আমার এই কথা শুনিয়া বালক একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আবার

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'মহাশয়! আমার জননী যদি সত্য সত্যই কুপথ-গামিনী না হইয়া থাকেন, তবে আমাদের প্রতিবেশী এইরূপ মিথ্যা কথা বলিবেন কেন? তাঁহার সহিত তো আমার জননীর কোনও শত্রুতা ছিল না।'

"আমি বলিলাম 'বাছা! এ সংসারের ভাবগতি কিছুই জান না—যে ব্যক্তির মনের যেরূপ ভাব, সে অন্যের চরিত্র সেই ভাবেই দেখে। দেবী-সিংহ তোমার জননীকে ধৃত করিয়া নিয়াছে, এই কথা শুনিয়া তাহারা নিশ্চয়ই অবধারণ করিয়াছে যে, তোমার জননী অবশ্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আর কি কারণ হইতে পারে? তাহারা তো আর তোমার জননীকে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে দেখে নাই। তাহারা এইরূপ অবস্থায় পড়িলে যেরূপ করিত, তোমার জননীও সেইরূপ করিয়াছেন মনে করিয়াই তোমাকে তাহারা এই সকল অমূলক কথা বলিয়াছে।'

"আমার এই শেষ কথা শুনিয়া বালকের মনের সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূর হইল। কয়েক দিন পরে সে আত্মহত্যা করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিল, এবং কোথায় যাইবে, কিরূপে জীবনযাপন করিবে, তৎসম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহাতে সে সম্মত হইল না। সে বলিল 'স্বদেশে গেলে লোক-গঞ্জনায় তাহার আবার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইবে।' আমিও তখন বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার স্বদেশে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহাকে এখানে থাকিয়া শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে বলিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই সে নানা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল। প্রায় পাঁচ সাত বৎসর হইল সে পঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, সেখানে সে এক জন প্রধান সৈন্যা-ধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছে। এখন পঞ্জাবে সে "দয়াল বাবু" নামে পরিচিত—"

পরমহংসের নিকট এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ সিংহ যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করিলেন। এবং প্রেমানন্দকে স্বদেশে প্রেরণ করিয়া, তিনি একাকী ক্ষেত্রনাথের অনুসন্ধানে পঞ্জাবে যাত্রা করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

দয়াল বাবু।

লক্ষ্মণসিংহ কাশী পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবাভিমুখে চলিলেন। সেই সময় দেশে রাস্তা ঘাটের বড় সুবিধা ছিল না। পথিকদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে হইলে নানা জঙ্গল ও পাহাড় পর্য্যটন করিতে হইত। কিন্তু কমলাদেবীকে সুখী করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণ কোনপ্রকার কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না,—কোনপ্রকার দুঃখকে দুঃখ বোধ করিতেন না।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য সম্প্রদায় লক্ষ্মণের ঈদৃশ আচরণ প্রশংসনীয় বলিয়া মনে না করিতে পারেন। তাঁহারা হয় তো লক্ষ্মণকে অশিক্ষিত বাতুল বলিয়া অভিহিত করিবেন। কিন্তু চিন্তাশীল লোকমাত্র লক্ষ্মণের এই নিঃস্বার্থ প্রেমের মধ্যে দেবত্বভাব দেখিতে পাইবেন!

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বার্থপরতার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে, কাপুরুষতা-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে, যদি শিক্ষার ত্রুটি হয়, তবে লক্ষ্মণ সিংহ অবশ্যই অশিক্ষিত ছিলেন! কিন্তু চিত্তোৎকর্ষসাধন, হৃদয়োন্নতি যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা লক্ষ্মণকে একেবারে অশিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সৎশিক্ষা বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া, তাহার অন্তরের শোভানুভাবকতা বিদূরিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অভিমান এবং আত্মসুখচিন্তা দ্বারা তাহার অন্তরাত্মাকে পরিপূর্ণ করিতেছে। ঈদৃশ শিক্ষার অভাবেই লক্ষ্মণের আচরণ এবং ব্যবহার নব্য সম্প্রদায়ের আচরণ এবং ব্যবহার হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, লক্ষ্মণ কমলাদেবীর নিমিত্ত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, ইহাতে তাঁহার লাভ কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মহাত্মা যীশুখৃষ্টের নিমিত্ত ষ্টিফেন এবং পল প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না কেন? হনুমান্ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যোদ্ধার করিতেন কেন? চৈতন্যদেবের নিমিত্ত রূপ এবং সনাতন সংসারের পদ প্রভুত্ব

পরিত্যাগ করিলেন কেন? খৃষ্ট, শ্রীরামচন্দ্র এবং চৈতন্যের মধ্যে তাঁহাদের ভক্তগণ যে সৌন্দর্য্যের ভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণও কমলাদেবীর মধ্যে সেই ভাব দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা দ্বারা লক্ষ্মণের শোভানুভাবকতা বিনষ্ট হয় নাই। সুতরাং কমলাদেবীর অন্তরস্থিত পবিত্র ভাব দর্শনে সহজেই মোহিত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ পথে বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রায় দুই মাস পরে পঞ্জাবে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কমলাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথ প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত পঞ্জাবে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি বার তের বৎসর বয়সের সময় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম যে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তাহা পঞ্জাবের অত্যল্প লোকেই জানিত। এখানে তিনি "দয়াল বাবু" নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি পঞ্জাবে একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। কিন্তু নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত বড় অর্থব্যয় করেন না। তাঁহার উপার্জ্জিত ধন দীন দুঃখীর উপকারার্থে ব্যয়িত হইত। কোনও লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, এ কথা শুনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহার বাড়ী যাইয়া তাহাকে অর্থ প্রদান করিতেন, তাহার তত্ত্ব লইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করিতেন। আপন উপার্জ্জিত অর্থ ষোড়শ ভাগ করিয়া তাহার পঞ্চদশ-ভাগ দীন দুঃখীর কষ্টদুঃখ মোচনার্থ দান করিতেন। বাকী একাংশের অর্দ্ধাংশ নিজে ব্যয় করিতেন এবং অপরার্দ্ধাংশ জননীর নিমিত্ত রাখিয়া দিতেন। পরমহংসের কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে, তাঁহার জননী জীবিত থাকিলে হয় তো ভবিষ্যতে কখনও জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে; এবং যদি সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহার ভরণ পোষণের নিমিত্ত এই সঞ্চিত অর্থ তাঁহাকে দিবেন। কিন্তু প্রত্যেক মাসে জননীর নিমিত্ত টাকা রাখিবার সময় চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া সময় সময় ভাবিতেন 'হায়! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছে, অতএব যত দিন আমার হাতে টাকা থাকিবে, সাধ্যানুসারে কাহারও অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে কখনও ত্রুটি করিব না।'

যখন লক্ষ্মণ সিংহ ক্ষেত্রনাথের ভবনে পৌঁছিলেন, তখন তিনি অনেকানেক দুঃখী কাঙ্গালীকে গৃহের প্রাঙ্গণে বসিয়া বস্ত্র বিতরণ করিতেছিলেন। এই সকল দীন দুঃখীদিগের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র দ্বারা হাঁটু হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই স্ত্রীলোকটির কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত ছিল। ইহাকে দেখিবামাত্র ক্ষেত্রনাথের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি এই স্ত্রীলোকের হাতে চারি পাঁচ খানা বস্ত্র এবং কয়েকটি টাকা দিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বার তের বৎসর পূর্ব্বে ক্ষেত্রনাথ যখন দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী এইপ্রকার একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতেন। আজ এই ভিক্ষার্থিনী দরিদ্রা রমণীকে সেইরূপ ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা দেখিয়া তাঁহার জননীর তৎকালের দুঃখ কষ্ট স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বীয় ভৃত্যকে উপস্থিত অন্যান্য ভিক্ষুককে বস্ত্র বিতরণ করিতে আদেশ করিয়া, নিজে তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বস্ত্রবিতরণান্তে ভৃত্য তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল—"হুজুর, আপনার বাড়ী হইতে আপনার মাঠাকুরাণের পত্র লইয়া একটি লোক আসিয়াছে। সে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

ক্ষেত্রনাথ শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি ভৃত্যের কোনও কথা শুনিতেও পাইলেন না। ভৃত্য আশ্চর্য্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে সে আবার বলিল—"হুজুর, আপনার বাড়ী হইতে আপনার মাঠাকুরাণের পত্র লইয়া একজন লোক আসিয়াছে।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ কি স্বপ্ন না কি? আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে!!! মাতার দুঃখ কষ্টের স্মৃতি আমাকে পাগল করিয়া তুলিল না কি? মা জীবিত থাকিলেও কিরূপে তিনি এখানে লোক পাঠাইবেন? এমন বান্ধব তাঁহার কে আছে যে, আমার অনুসন্ধানে পঞ্জাবে আসিবে? আর আমি যে এখানে আছি, তাহাই বা তিনি কিরূপে জানিবেন? এ মাতৃশোক বুঝি আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!

ভৃত্য আবার বলিল "হুজুর, আপনার দেশ হইতে লোক আসিয়াছে।"

তখন তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম পূর্ব্বক চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন "কে আসিয়াছেন, তাঁহাকে এখানে আসিতে বল।"

ভৃত্য তখন লক্ষ্মণ সিংহকে ডাকিয়া আনিল। লক্ষ্মণ ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার কালে দেখিতে পাইলেন যে, অসংখ্য দীন দুঃখী "দয়াল বাবুর জয় হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নূতন বস্ত্র হস্তে করিয়া বাহির হইতেছে। তিনি ক্ষেত্রনাথের নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন "মহাশয়, আমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছি। আপনার নাম কি ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাঁ আমার নাম ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।"

লক্ষ্মণ। মুর্শিদাবাদের জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার পিতা ?

ক্ষেত্রনাথ। হাঁ।

লক্ষ্মণ। আপনাদের ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইলে পর, আপনি বার তের বৎসরের সময় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?

ক্ষেত্রনাথ। আপনি এই সকল বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

লক্ষ্মণ। আমি বিগত এগার বৎসর পর্য্যন্ত দেশে দেশে আপনার অনুসন্ধান করিতেছি। কয়েক মাস হইল, কাশীতে একজন পরমহংসের নিকট আপনার তত্ত্ব পাইয়া এখানে আসিয়াছি। আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার সহোদর বলিয়া জানিবেন। আপনার জননী কমলাদেবীকে আমি আপন গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করি।

জননীর নাম শ্রবণমাত্র ক্ষেত্রনাথের দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিছুকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে আত্মসংযম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জননী এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা কি আপনি জানেন ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ একে একে কমলাদেবীর সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। যেরূপে কমলাদেবী ক্ষিপ্ত অবস্থায় দেবীসিংহের লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, যেরূপে পরে তিনি দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড় হইতে মুক্ত হইয়া রাম সিংহের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধান ও পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি সমুদয় ঘটনা তিনি ক্ষেত্রনাথের নিকট বলিলেন।

তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সময় ক্ষেত্রনাথের দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্মণের সমুদয় কথা শেষ হইবামাত্র ক্ষেত্রনাথ স্বীয় বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন "হা পরমেশ্বর! আমার ন্যায় পাপাত্মা আর জগতে নাই। পরমা সাধ্বী মাতৃদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে এ পাপ মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল! শাস্ত্রে বলে—বিবেক ঈশ্বরবাণী। তবে বিবেক আমাকে কেন প্রতারিত করিল? হয় আমার বিবেক নাই, না হয় আমার বিবেক দূষিত হইয়াছে। এখনই এই পাপ-প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, এবং ভৃত্যকে মস্তকে জলসেচন করিতে বলিলেন।

কিছু কাল পরে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বারংবার আপনাকে তিরস্কার পূর্ব্বক অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিলেন "হায় আমি কি পাপাত্মা! কি নরাধম!—বার বৎসর পর্য্যন্ত আমার জননী এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন! এ পাপ-মুখ আর জননীকে দেখাইব না।"

লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ক্রন্দন নিবারণ হইল না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণের পদতলে মস্তক রাখিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাই, তুমি ধন্য! তুমি দেবতা! তুমিই আমার পুণ্যবতী জননীর উপযুক্ত পুত্র। এবং তিনি তোমারই উপযুক্ত মাতা। আমার ন্যায় পাপাত্মা সে পুণ্যবতীকে মা বলিয়া ডাকিলে, তিনি কলঙ্কিত হইবেন। ভাই, আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জননীর নিকট বলিবে, এ পাপাত্মা অকৃতজ্ঞ সন্তানকে যেন তিনি বিস্মৃত হয়েন। এ পাপাত্মার জন্য যেন তিনি এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন না করেন। আমি নিতান্ত নরাধম! আমার হৃদয় অত্যন্ত কুটিল। তাহা না হইলে প্রতিবেশীদিগের কথা শুনিয়া এইরূপ সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইবে কেন? ধন্য পরমহংস! সত্যই তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে সক্ষম।"

লক্ষ্মণ বলিলেন "ভাই, তুমি কি পাগলের ন্যায় কথা বলিতেছ! তোমার শোকে জননী সর্ব্বদাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। শত চেষ্টা করিয়াও আমি

তাঁহাকে সুখী করিতে পারি নাই। দেবীসিংহের স্ত্রী-খোঁয়াড়ে অবস্থানকালে, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া তিন চারিবার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমার মুখ দেখিবার আশায় কেবল আত্মহত্যা করেন নাই। তুমি আত্মহত্যা করিলে, তিনিও আত্মহত্যা করিবেন। সুতরাং মাতৃহত্যার পাপ তোমাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় করিবে।"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি বড় অকৃতজ্ঞ সন্তান। আমি কিরূপে জননীকে মুখ দেখাইব? আমি এতকাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছি!"

লক্ষ্মণ। ভাই, সন্তান অকৃতজ্ঞ হইলে জননী কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সন্তান ভালই হউক, আর মন্দই হউক, মার স্নেহ কিছুতেই হ্রাস হয় না। মাতৃস্নেহ যে কি পদার্থ, তাহা কেহ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না; সে কবির কল্পনাকেও পরাস্ত করে।

লক্ষ্মণ এইরূপে বুঝাইলে পর, ক্রমে ক্ষেত্রনাথের আত্মগ্লানি হ্রাস হইতে লাগিল। লক্ষ্মণের সমুদয় কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এবং দুই তিন দিন পরেই স্বদেশে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যে দয়াল বাবুর পঞ্জাব পরিত্যাগের কথা প্রচার হইল। বহুসংখ্য লোক তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার নিমিত্ত বড় দুঃখিত হইলেন। দীন দুঃখী লোক দলে দলে আসিয়া বলিতে লাগিল "দয়াল বাবু! তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি উপায় হইবে?"

ক্ষেত্রনাথ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তিনি আবার সত্বরই স্বীয় জননীকে সঙ্গে করিয়া পঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি নরকতুল্য বঙ্গদেশে কখনও অবস্থান করিবেন না। ১১৮৯ সনের মাঘ মাসে (১৭৮৩ সালের জানুয়ারী) ক্ষেত্রনাথ লক্ষ্মণের সঙ্গে একত্র হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিংশ অধ্যায়

সুপ্রিম কোর্ট।

বিপদ্, দারিদ্র্য এবং দুঃখ সকল অবস্থায়ই মনুষ্যের শত্রু নহে। বিপদ্ এবং দুঃখরাশি বন্ধু হইয়া মানবের হৃদয় সমুন্নত করে, গুরু হইয়া তাহাকে সৎশিক্ষা প্রদান করে, নেতা হইয়া তাহাকে জীবনের সংগ্রামে পরিচালন করে। পক্ষান্তরে সম্পদ্ এবং ঐশ্বর্য্য অনেকানেক স্থলে শত্রু হইয়া মনুষ্যকে গর্ব্বিত করে, অহঙ্কারী করে, তাহার হৃদয় মন কলুষিত করে এবং পরিণামে তাহাকে বিলাসী, অলস এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে।

চির সম্পদ্ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে প্রতিপালিত বঙ্গীয় শত শত জমিদারের সন্তান, ধনীর সন্তান চিরমূর্খ হইয়া রহিয়াছে,—পশুজীবন যাপন করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় ইহাদিগের হস্তপদ, মনুষ্যের ন্যায় ইহাদিগের অঙ্গগঠন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা ইহাদিগকেও মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু ইহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি, ইহাদিগের কার্য্যকলাপ, ইহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে কে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে, ইহাদের মধ্যেও মনুষ্যাত্মা আছে?

বঙ্গ-মহিলা সত্যবতী দেবী এখন স্বামীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অলৌকিক সাহস এবং বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শ্বশুরকে কারামুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহস, বীরত্ব এবং অলৌকিক ত্যাগস্বীকারের ভাব কে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছে? কোন্ বিদ্যালয়ে তিনি এবংবিধ সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছেন? যখন সম্পদের ক্রোড়ে শয়িত ছিলেন, তখনই বা তিনি কি ছিলেন? এখন বর্ত্তমান বিপদ্‌রাশিই বা তাঁহাকে কি করিয়া তুলিয়াছে? তাঁহার হৃদয় মন কতদূর সমুন্নত হইয়াছে, এই বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে তাঁহার নিজের মুখের কথাগুলি স্মরণ করা উচিত। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর যে দিন ধৃত হইয়াছিলেন, সে দিন তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে, বিবিধ বিপদ্ এবং সঙ্কটে পড়িয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সম্পদের ক্রোড়ভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে স্বামীকে সময় সময় সদনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন যে, তাঁহার পতি দেবতা। তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

তবে মানুষ বিপদে পড়িয়া কেন পরমেশ্বরকে দোষারোপ করে? বিপদ্ মানুষের বন্ধু, বিপদ্ মানুষের গুরু, বিপদ্ মানুষের নেতা।

বিপদ্ সত্যবতীকে অলৌকিক সাহস প্রদান করিয়াছে। তিনি স্বামীর উদ্ধারার্থ এখন কলিকাতা আসিয়াছেন। মালদহের অন্তর্গত পাড়ুয়ার জঙ্গল হইতে বরাবর পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন। তিন দিনের মধ্যেই কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। দিবারাত্রের মধ্যে পথে বড় বিশ্রাম করেন নাই। রঙ্গপুরে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। এখন প্রেমানন্দ সেখানে না যাইতে পারিলে, সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম বিফল হইবে। সুতরাং বঙ্গ-মহিলা সত্যবতী প্রায় এক শত ক্রোশ পথ তিন দিন তিন রাত্রে হাঁটিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতা যাত্রা করিবার সময়ই তিনি পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। কলিকাতা আসিয়া রামকৃষ্ণ অধিকারী বলিয়া আপন পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

কিন্তু এখানে পৌছিয়াই শুনিতে পাইলেন যে, সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত না করিলে তাঁহার স্বামীর কারামুক্তির উপায় নাই। এই সময়ে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত, কিংবা অন্য কোনও কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর অথবা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ যে সকল দেশীয় লোককে কয়েদ করিতেন, তাঁহারা সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই তাঁহাদের কারামুক্তির নিমিত্ত হেবিয়াস্ কর্পাস্ (Habeas corpus) নামক পরওয়ানা বাহির হইত। সুপ্রিম কোর্টের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের বিলক্ষণ বিবাদ ছিল। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ যাহাদিগকে কয়েদ রাখিতেন, সুপ্রিম কোর্ট তাহাদিগকে খালাস দিতেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণের জ্ঞাত করণার্থে আমরা এই স্থানে সুপ্রিম কোর্টের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে জন্য বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিতেছি।

সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপনের পূর্ব্বে কলিকাতায় মেয়র কোর্ট নামে এক বিচার-আদালত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে মেয়র কোর্টের বিচারকগণ নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ-মধ্যে প্রায় সকলেই ঘোর অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া দেশীয় লোকের অর্থাপহরণ করিতেন। সুতরাং মেয়র কোর্টের

দ্বারা কোনপ্রকার সুবিচার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহারা রাত্রে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চুরি ডাকাতি করিতেন, দিনে আবার তাঁহারাই বিচারকের গাউন পরিধান পূর্ব্বক, মেয়র কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া সেই সকল অত্যাচারের বিচার করিতেন। এই প্রকারেই মেয়র কোর্টের সদ্বিচার চলিতে লাগিল।

কিন্তু ডাণ্ডাস্ প্রভৃতি ইংলণ্ডের কয়েক জন সহৃদয় লোক মেয়র কোর্টের এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের পক্ষ হইতে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে অবিলম্বে মেয়র কোর্ট এবলিশ হইয়া, কলিকাতায় সুপ্রিম্ কোর্ট সংস্থাপিত হইল। সার ইলাইজা ইম্পি চিফ্ জষ্টিসের পদে, আর হাইড্, লিমেইষ্টার এবং চেম্বার্স্ সাহেবত্রয় কনিষ্ঠ জজের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টই বল, আর মেয়র কোর্টই বল, লঙ্কায় যিনি প্রবেশ করেন, তিনিই হনুমান্; অমৃত ফলের লোভ তাঁহারা কেহই সংবরণ করিতে পারেন না; সকলেই গাছের গোড়াশুদ্ধ গ্রাস করিতে চাহেন,—সকলেই একাধিপত্যের নিমিত্ত লালায়িত। সুপ্রিম কোর্টের জজেরা সকল বিষয়ে এবং দেশের সকলের উপর ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে চাহিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস পূর্ব্বে তাঁহার বিপক্ষদলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ দুইবার সুপ্রিম কোর্টের শরণাগত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সুপ্রিম কোর্টকে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার বিপক্ষদল হ্রাস করিয়াছে। এখন আর তিনি সুপ্রিম কোর্টের অধীনতা কেন স্বীকার করিবেন? সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিবাদ উপস্থিত হইল।

সুপ্রিমকোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কিংবা অন্য কোনও কারণে যে সকল দেশীয় লোককে গবর্ণমেণ্ট কয়েদ করিতেন, সুপ্রিম্ কোর্ট তাহাদিগকে খালাস দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বিবাদ ছিল বলিয়াই অনেকানেক লোক ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন।

"রামকৃষ্ণ অধিকারী"-নামধারিণী ছদ্মবেশিনী সত্যবতীকে কলিকাতায় সকলেই বলিতে লাগিল যে, সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই প্রেমানন্দ গোস্বামী

দুই এক মাসের মধ্যে খালাস হইবেন। কিন্তু রঙ্গপুরে এদিকে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। আর দুই এক মাস প্রেমানন্দকে কয়েদে থাকিতে হইলে, তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা।

এতদ্ভিন্ন সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিতে হইলে অনেক ব্যয়ের আবশ্যকতা। কিন্তু সত্যবতীর কোনও ব্যয় বহন করিবার সাধ্য নাই।

কলিকাতার জেল দেবীসিংহের কারাগারের ন্যায় নহে যে, জেলের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; সুতরাং তিনি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঁদির অন্তর্গত তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানে গিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে শত শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার বাসস্থানে যাইতেছিলেন। এই সকল লোক পরস্পরের নিকট বলিতেছিলেন যে, মাতৃশ্রাদ্ধের দিন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ একেবারে কল্পতরু হইয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার নিকট সে দিন যে যাহা চাহিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

এই সকল লোকের কথা শুনিয়া সত্যবতী মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট যাইয়া, তাঁহার স্বামীর কারামুক্তির প্রার্থনা করিবেন। গঙ্গাগোবিন্দ আপন ব্রত প্রতিপালনার্থ নিশ্চয়ই বাধ্য হইয়া তাঁহার স্বামীকে কারামুক্ত করিয়া দিবেন।

এইপ্রকার স্থির করিয়া তিনিও অন্যান্য লোকদিগের সঙ্গে গঙ্গাগোবি-[illegible] চলিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞ চেয়েও অধিক।

Ganga Govinda—"a name at the sound of which all India turns pale—the most wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever the rank servitude of that country has produced."—*Edmund Burke.*

গঙ্গাগোবিন্দ—শত বৎসর পূর্ব্বে এ নাম শ্রবণে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় বিকম্পিত হইত। দেশের সমুদয় জমিদার ইঁহার পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠন করিতেন। নজর হস্তে করিয়া তাঁহারা ইঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। বঙ্গের ছোট বড় আবালবৃদ্ধ সকলেই গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় করিতেন। কেনই বা করিবেন না? ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ দেশের সকল লোকের অর্থাপহরণ করিয়া হেষ্টিংসের পকেট পূর্ণ করিতে লাগিলেন, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া হেষ্টিংসের উৎকোচ সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন, হেষ্টিংসের উপকারার্থ তিনি প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং হেষ্টিংসও গঙ্গাগোবিন্দের ক্রীত-দাস হইয়া পড়িলেন।

সম্প্রতি গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষ সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিবেন। নবকৃষ্ণ মুন্সী মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ অপেক্ষাও তাঁহার উচ্চতর পদ প্রভুত্ব রহিয়াছে। যদি নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রদ্ধ অপেক্ষা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে অধিকতর সমারোহ না হয়, তবে তাঁহার এ পদ প্রভুত্ব বৃথা।

গঙ্গাগোবিন্দ মাতৃশ্রাদ্ধের সময় ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলার কলেক্টর এবং কলেক্টরের দেওয়ানের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—

"গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ আমার নিজের মাতৃশ্রাদ্ধ মনে করিয়া এ শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহার্থ তোমাদের প্রত্যেকের আপন আপন জিলায় যতপ্রকার উৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা বহুল পরিমাণে প্রেরণ করিবে।

এ বিষয়ে কোনও শৈথিল্য কিংবা অমনোযোগ করিবে না। তোমাদের প্রেরিত জিনিসের মূল্য পরে দেওয়া হইবে।”

হেষ্টিংসের এই সার্কুলার প্রাপ্তির পর প্রত্যেক জিলার কলেক্টরের দেওয়ান আপন আপন এলাকার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন হাট বাজারে নানা প্রকারের ফল মূল এবং অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য ক্রয়ার্থ বরকন্দাজ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সমুদয় বঙ্গদেশে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শ্রীহট্টের পূর্ব্ব সীমানা হইতে বেহারের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, এবং রঙ্গপুর দিনাজপুরের উত্তর প্রান্ত হইতে সমুদ্রতটস্থ ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যন্ত —সমুদয় দেশের হাট বাজারে কেবল গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি আহৃত হইতে লাগিল।

কিন্তু সমুদয় দ্রব্যই বাকীতে ক্রয় করা হইল। হেষ্টিংস সমুদয় কলেক্টরদিগের নিকট লিখিলেন যে, শ্রাদ্ধের পর দ্রব্যাদির মূল্যের হিসাব প্রস্তুত হইবে। কলেক্টরের দেওয়ানেরা তাঁহাদিগের অধীন জমাদার এবং বরকন্দাজদিগকে জিনিস ক্রয় করিতে আদেশ করিলেন। জমাদার এবং বরকন্দাজগণ যে দোকানে যে জিনিস পাইল, সমুদয় বাকীতে আনিতে লাগিল। তাহার আর দর দাম করিতেও হইল না। সরকারী কার্য্যকারকদিগের নিকট জিনিস বিক্রয় হইতেছে, বিল পাঠাইলেই টাকা পাইবে। ইহার আর একটা দর দাম করার প্রয়োজন কি ?

এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জিলার বরকন্দাজগণ বিক্রেতাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা সবিস্তর লিখিতে হইলে পুস্তকের আয়তন আরও পাঁচ শত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু পাঠকগণের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। পুস্তকের আয়তন আর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। সংক্ষেপে এই সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠকগণ সমুদয় বুঝিতে পারিবেন।

যে সকল ফল অল্পদিনের মধ্যে সুপক্ক হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তৎসমুদয় কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নিকটস্থ স্থানেই ক্রয় করা হইল। নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুরের বাজারে একাদশবর্ষীয়া একটি বালিকা এক কাঁদি রম্ভা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। কলেক্টরের বরকন্দাজগণ তখন রম্ভা ইত্যাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিতেছিল। তাহারা বালিকার হস্ত হইতে রম্ভা কয়েকটী লইয়া গেল।

বালিকা সজল নয়নে বলিতে লাগিল—"আমার মা অন্ধ—কা'ল বৈকালে আমাদের ঘরে চাউল ছিল না—কিছুই খেতে পাই নাই—এই কলা কয়েকটি বেচিয়া চাউল কিনিয়া নিব—আমাকে কলার দাম দেও।"

বরকন্দাজ সাহেব বলিলেন, "চুপ কর্ বজ্জাৎ ছুঁড়ী—পরে দাম পাবি—এখন বাড়ী যা—"

বালিকা ভয় ও ত্রাসে রিক্তহস্তে বাড়ী চলিয়া গেল।

হুগলীর অন্তর্গত বর্ত্তমান উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে চৌদ্দ বৎসর-বয়স্ক একটী বালক ডাব বিক্রয় করিতেছিল। বরকন্দাজগণ তাহার ডাব কয়েকটি লইয়া চলিল।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ডাবের পয়সা দেও। আমার বাবার জন্য গাঁজা কিনে নিব। বাবার আজ একেবারে গাঁজা নাই। গাঁজা না লইয়া বাড়ী গেলে বাবা আমাকে মেরে খুন ক'র্‌বে। আমার ডাবের পয়সা দেও—আমার ডাবের পয়সা দেও।"

বরকন্দাজ সাহেব বালকটীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ডাব নিয়া চলিয়া গেল। বালক তাহার পিতার ভয়ে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। পলাইয়া সে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

দিনাজপুরের একটি স্ত্রীলোক এক ঝুড়ি আলু বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। এক জন বরকন্দাজ আসিয়া তাহার আলুর ডালি ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোক বুকের নীচে ডালি খানি রাখিয়া অবিশ্রান্ত বলিতেছে—"পয়ছা নাদে—তো নাদি*—নাদি—নাদি।"

বরকন্দাজগণ স্ত্রীলোকটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার সমুদয় আলু লইয়া চলিয়া গেল।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত কাউখালির বাজারে সতের আঠার বৎসর-বয়স্ক একটি মুসলমান যুবক সাত আট চাঙ্গারী চাউল বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। চাউলের চাঙ্গারী তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। তাহার পিতা, পিতৃব্য এবং মাতুল নদীর ঘাটে এক বড় নৌকার লোকের সঙ্গে চাউলের দাম ঠিক করিবার নিমিত্ত কথা বলিতেছে। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বরকন্দাজ সেখানে চাউল ক্রয় করিতে আসিয়া, যুবকের সম্মুখস্থিত চাউলের চাঙ্গারী

* নাদি অর্থ—দিব না।

ধরিয়া চাউল লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, যুবক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল "ও বাজান—ও চুচু—ও মামু—হালা বরকন্দাজ চাউল লইয়া যায়।"

যুবকের পিতা, পিতৃব্য এবং মাতুল তাহার চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। বরকন্দাজদিগের হস্ত হইতে চাউল ছিনাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। বরকন্দাজগণ প্রহৃত হইয়া কোতয়ালের নিকট এজাহার করিল যে, তাহাদের ক্রীত চাউল কাউখালির মুসলমানগণ ডাকাতি করিয়া নিয়াছে। কোতাল তদন্ত করিয়া কাউখালির বাজার হইতে ত্রিশ জন লোককে ডাকাত বলিয়া ঢাকায় চালান করিল। কাউখালিতে অনেক ডাকাতের বাড়ী বলিয়া প্রবাদ ছিল। ইহারা চালান হইবার তিন চারি মাস পরে ইহাদিগের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইল।

এই প্রকারে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তি হইলে এই সকল জিনিস ক্রমে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। প্রায় বিশ লক্ষ লোকের আহারের উপযোগী জিনিস আহৃত হইল। কাঁদিতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাড়ী শ্রাদ্ধের পনের দিন পূর্ব্ব হইতেই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। বোধ হয় অন্যূন তিন ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া লোকদিগের থাকিবার নিমিত্ত ছাপড়ার ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল।

এ দিকে দেশের যত রাজা, জমিদার, তালুকদার—সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র সকলেই ফৌজদারি আদালতের সমন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব অসন্তুষ্ট হইলেও লোকের রক্ষা আছে, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা নাই।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া স্বীয় পুত্র রাজা শিবচন্দ্রকে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী যাইতে বলিলেন। রাজা শিবচন্দ্র অত্যন্ত জাত্যাভিমানী ছিলেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দের ন্যায় কোনও কায়েতের বাড়ী যাইতে প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না।

তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "বাপু! তুমি না গেলে আমি এই রুগ্ন শরীর লইয়া গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী যাইব। গঙ্গাগোবিন্দকে আমি কখনও অসন্তুষ্ট করিব না।"

রাজা শিবচন্দ্র দেখিলেন যে, তিনি না গেলে তাঁহার পিতা রুগ্ন শরীরেই গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী যাইবেন। সুতরাং তিনি গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী যাইতে স্বীকার করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই রুগ্নাবস্থায় কালযাপন করিতেন। সেই জন্যই সময় সময় তিনি শিবচন্দ্রকে কলিকাতা যাইয়া গঙ্গাগোবিন্দের দরবার করিতে বলিতেন। কিন্তু শিবচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের নিকট যাইতে স্বীকার করিতেন না। তজ্জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের নিকট পত্রে লিখিতেন—

"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য;
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।"

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন রাজা শিবচন্দ্র কাঁদিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখাইতে লাগিলেন।

শিবচন্দ্র এক হাজার লোক সঙ্গে করিয়া কাঁদিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, অনেক লোক সঙ্গে করিয়া গেলে গঙ্গাগোবিন্দ তাহাদের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি দিতে অসমর্থ হইবেন। সুতরাং তিনি অনায়াসে গঙ্গাগোবিন্দকে অপদস্থ করিয়া আসিতে পারিবেন।

শিবচন্দ্র কাঁদিতে পৌঁছিলে পর প্রায় পাঁচ হাজার লোকের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার থাকিবার গৃহে পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমুদয় জিনিসপত্র কাঙ্গালিদিগকে দান করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ আবার পাঁচ হাজার লোকের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র তাহাও তৎক্ষণাৎ কাঙ্গালিদিগকে বিতরণ করিলেন। শিবচন্দ্রের ইচ্ছা যে, গঙ্গাগোবিন্দকে অপদস্থ করিবেন। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ এত অধিক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, ক্রমে পাঁচ বার শিবচন্দ্রের গৃহে এইরূপ আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইলেন। অবশেষে শিবচন্দ্র অবাক্ হইয়া গঙ্গাগোবিন্দকে বলিলেন—

"ভাই! তোমার এ যে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন—কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছ।"

গঙ্গাগোবিন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আজ্ঞে দক্ষযজ্ঞ চেয়েও অধিক।"

শিবচন্দ্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে গঙ্গাগোবিন্দ বিনীতভাবাবলম্বন

পূর্ব্বক আপনাকে অবনত করিবেন। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ তৎপরিবর্ত্তে বিশেষ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন যে "দক্ষযজ্ঞ চেয়েও অধিক।"

গঙ্গাগোবিন্দের এইরূপ আস্পর্দ্ধা দেখিয়া শিবচন্দ্র মুখ ভার করিয়া বসিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "মহারাজ! দক্ষযজ্ঞ চেয়ে অধিক নহে? দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই; কিন্তু আমার বাড়ীতে স্বয়ং শিবচন্দ্র উপস্থিত।"

তোষামোদ-বাক্যে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েন। শিবচন্দ্র এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যাইবার সময় মনে করিয়াছিলেন যে, নিজে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ীতে কখনই জলস্পর্শ করিবেন না। কিন্তু অবশেষে এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ীতে আহারাদিও করিয়াছিলেন।

অভ্যাগত রাজা এবং জমিদারদিগকে যথোচিত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া রাত্রে গঙ্গাগোবিন্দ শয়নার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। দেশীয় চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মাতৃবিয়োগের পর এক মাসের মধ্যে কেহ পত্নীর শয্যায় শয়ন করে না। কিন্তু নিশীথে গঙ্গাগোবিন্দ প্রায়ই নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সেই জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই সময়েও গঙ্গাগোবিন্দের শয়নাগারের নিকটস্থ প্রকোষ্ঠে থাকিতে হইত। গঙ্গাগোবিন্দ চীৎকার করিয়া উঠিলে, তিনি তাঁহার শয্যা-প্রকোষ্ঠে যাইয়া স্বামীর মস্তকে জলসেচন করিতেন, স্বামীকে বাতাস করিতেন। স্বামীর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রাণান্তেও অন্যকে জানিতে দিতেন না।

গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সুনিদ্রাসম্ভূত বিশ্রামশান্তি তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তাঁহার একটু নিদ্রার আবেশ হইবামাত্রই তিনি প্রথমতঃ অন্যান্য দিবসের ন্যায় আজও স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যে, ছুরিকাহস্তে কমলাদেবী মৃত সন্তানদ্বয় কক্ষে করিয়া তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন। তাঁহার নিকটে আসিয়াই তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছেন। মৃত সন্তানদ্বয়কে তাঁহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। আবার পশ্চাৎ হইতে কমলার স্বামী জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য স্বীয় পৈতার দ্বারা তাঁহার গলদেশ বন্ধন করিতেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের সহধর্ম্মিণী ইতিপূর্ব্বে একদিন স্বামীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কমলাদেবীকে আবার যখন স্বপ্নে দেখিবে, তখনই স্বপ্নাবেশে

তাঁহার পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠন করিয়া বলিবে "মা, আমাকে রক্ষা কর—এ ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

সহধর্ম্মিণীর সেই উপদেশ আজ নিদ্রিতাবস্থায় গঙ্গাগোবিন্দের স্মরণ হইল। কমলাদেবীর পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক বলিলেন "মা! তুমি পরমা সাধ্বী! আমাকে ক্ষমা কর—এ ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় গঙ্গাগোবিন্দ এই কথা বলিবামাত্র, কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইল! তিনি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যে, শত শত ব্রাহ্মণ, সহস্র সহস্র কৃষক দৌড়িয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল "রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া হেষ্টিংসের প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত তুই আমাদিগকে সমুদয় স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিস্। আমাদের ব্রহ্মত্র, আমাদের সকলের জমিদারী তুই নষ্ট করিয়াছিস্। তোর অত্যাচারে আমরা সবংশে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অনাহারে আমাদের শিশুসন্তান মরিয়া গিয়াছে। আজ বার বৎসর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিতেছিস্। ইহার প্রতিফল তোকে এখনই দিব।"

এই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চারি পাঁচ জনের গলদেশে সুদীর্ঘ রজ্জু দোলায়মান রহিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে পর, সন্তান সন্ততির দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহ কেহ গঙ্গাগোবিন্দের বুক চাপিয়া ধরিলেন, কেহ মুখ চাপিয়া ধরিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ একেবারে ফাঁফর হইয়া পড়িলেন। আজ আর তাঁহার চীৎকার করিবার সাধ্য নাই। বুকে এবং গলদেশে পাষাণ চাপিলে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, আজ গঙ্গাগোবিন্দের তাহাই হইল।

কিছু কাল পরে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, সম্মুখে এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে—শত শত মৃত শরীর সে নদীর মধ্যে ভাসিতেছে। সেই সকল মৃত শব হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। সম্মুখস্থ ব্রাহ্মণ এবং কৃষকগণ গঙ্গাগোবিন্দকে সেই নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিতেছেন।

হস্তপদবন্ধনের পরে তাঁহারা তাঁহার বুক এবং গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁহারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিবামাত্র, তিনি অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তাঁহার অস্তকার চীৎকারের শব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্ন গৃহস্থিত অন্যান্য লোকও জাগরিত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, তিনি জাগরিত হইয়া শয্যোপরি বসিয়া কাঁপিতেছেন।

অন্য কেহ তাঁহার এই স্বপ্নবিবরণ জানিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী গৃহস্থিত অপরাপর লোককে বিদায় দিয়া ঠিক দময়ন্তীর ন্যায় স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক জলসেচন এবং বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ একটু সুস্থ হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন "প্রিয়ে! তোমার সেই উপদেশানুসারে আজ স্বপ্নাবস্থায় কমলাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম "মা! আমাকে ক্ষমা কর।" এই কথা বলিবামাত্র কমলাদেবী অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর শত শত ব্রাহ্মণ এবং সহস্র সহস্র কৃষক আমার দিকে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বন্ধন করিয়া সম্মুখস্থ এক রক্তের নদীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা যখন আমার বুকে চাপিয়া বসিল, তখন আমার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল।"

গঙ্গাগোবিন্দের এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী কিছুকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সাধ্বী রমণীরা কোনও পুস্তক ইত্যাদি পাঠ কিংবা কোনও শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিলেও, শুদ্ধ কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সময় সময় অনেকানেক যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিতে সমর্থ হয়েন। গঙ্গাগোবিন্দের স্ত্রী অত্যন্ত পুণ্যবতী ছিলেন। ইঁহার পুণ্যফলেই বোধ হয় উত্তরকালে লালা বাবুর ন্যায় পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুণ্যবতী সাধ্বী স্বীয় স্বামীর স্বপ্নবিবরণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "নাথ! আমার বোধ হয়, কমলাদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবামাত্র, ভগবান্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অন্যান্য পাপ এবং কুকার্য্যের দিকে তোমার চক্ষু ফিরাইয়া দিয়াছেন। একটি কুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই, ক্রমে অন্যান্য কুকার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। এই সমুদয় লোকের নিকটই তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার দ্বারা যে যে লোকের অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা কর। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে এই দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা করিবেন।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন "প্রিয়ে! আমার বড় ভয় করে। আমি আর ক্ষমা প্রার্থনা করিব না। এক জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবামাত্র আজ হাজার লোক আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। আবার ঐ হাজার লোকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলে, লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আমার প্রাণসংহার করিবে। যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, এখনও আমার প্রাণ কাঁপিতেছে! এই সকল কথা বিস্মৃতির সাগরে ডুবাইতে না পারিলে আর আমার সুখ শান্তি নাই।"

* * *

এই সকল কথাবার্ত্তার পর গঙ্গাগোবিন্দ পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু পূর্ণ নিদ্রা হইতে না হইতেই আবার কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। সেই পূর্ব্বের রক্তের নদী এবার একেবারে সমুদ্র হইয়া পড়িল। এ সমুদ্রের আর অপর কোনও পার দেখা গেল না। সেই অকুল-রক্ত-সাগরের পার্শ্বে তিনি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! অনেক দূর হইতে একটী স্ত্রীলোক দৌড়িয়া তাঁহার নিকট আসিতেছে। স্ত্রীলোকটীর পাছে পাছে সহস্র সহস্র লোক হাতে লাঠী ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ধাবিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী তাঁহার নিকট আসিবামাত্র, তিনি দেখেন যে, তাঁহার জননী। তিনি স্বপ্নাবস্থায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার জননী আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "বাছা! আমাকে রক্ষা কর— আমাকে রক্ষা কর, ঐ দেখ শত শত লোক আমার পাছে ধাবিত হইয়াছে।" পশ্চাতের লোকারণ্য ক্রমে নিকটে আসিল। তাঁহার জননী তখন পুত্রের বক্ষের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লোকারণ্যের মধ্যে কেহ শ্রীহট্টের ভাষায়, কেহ দিনাজপুরের ভাষায় গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্য হইতে একাদশবর্ষীয়া একটি বালিকার পশ্চাতে একটি বৃদ্ধা রমণী একখানি যষ্টির প্রান্ত ধরিয়া আসিতেছিল। বালিকা যেন অন্ধকে সঙ্গে করিয়া ভিক্ষা করিতে চলিয়াছে। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের নিকট আসিবামাত্র সে শরবিদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিতে করিতে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের উপর আঘাত করিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধা রমণী "আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায়" বলিয়াই তাঁহার মস্তক কামড়াইয়া ধরিল।

তৎপর একটা অস্থিচর্ম্মসার লম্বা পুরুষ গাঁজাখোরের ন্যায় খক্ খক্

করিয়া কাসিতে কাসিতে তাঁহার নিকট আসিল। তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া শোণিত-সাগরের কিনারায় লইয়া গেল। সমুদ্রের মধ্যে একটা বালকের মৃত শব ভাসিতেছিল। গাঁজাখোর সেই বালকের মৃত শব সমুদ্র হইতে উঠাইয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যেন লোকারণ্যের মধ্য হইতে চারি পাঁচ জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার জননীকে সেই শোণিত-সাগরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আবার কি হইল—আবার কি হইল!" বলিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ত্রস্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার মস্তকে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় এই প্রকারে আবার গঙ্গাগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া ভয়ে আর নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন না। চিন্তাকুলচিত্তে বসিয়া স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। সংসারের এ পদ প্রভুত্ব অসার বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু নিশাবসান হইবামাত্র সংসারের কোলাহলে সকলই বিস্মৃত হইলেন। বিস্মৃতিসাগরে পূর্ব্ব রাত্রির মানসিক যন্ত্রণা একেবারে ডুবাইয়া দিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

এ তো নদীর জল নদীতেই ঢালিতেছ।

আজ গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার ভদ্রাসন হইতে তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত একেবারে লোকারণ্যে পরিপূর্ণ হইল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে স্তূপে স্তূপে আহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল।

শত শত ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ আসিয়া দানের প্রত্যাশায় এক স্বতন্ত্র গৃহে

বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিমন্ত্রিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহাদের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট গৃহে বসিয়া দূরদেশাগত অনেকানেক পণ্ডিত-দিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদিগকে ভিক্ষাজীবীদিগের ন্যায় সাধারণ দানগৃহে যাইয়া যাচ্ঞা করিতে হয় না।

ছদ্মবেশী রামকৃষ্ণ অধিকারী ভিক্ষাজীবীদিগের সঙ্গে সাধারণ দানগৃহে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কিছুকাল পরে রাশি রাশি রৌপ্যমুদ্রা সঙ্গে লইয়া গঙ্গাগোবিন্দের কর্ম্মচারিগণ ভিক্ষাজীবীদিগকে বিদায় করিতে আসি-লেন। কাহারও হাতে চারি টাকা, কাহারও হাতে পাঁচ টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। ভিক্ষাজীবিগণ-মধ্যে কেহ কেহ রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াই সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় হইল। কিন্তু কেহ আর কিছু পাইবার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ অধিকারীকে টাকা দিতে চাহিবামাত্র তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন "স্বয়ং দানকর্ত্তা ভিন্ন অন্য কাহারও হস্ত হইতে দান গ্রহণ করিব না।"

গঙ্গাগোবিন্দ আজ আর একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি কখনও এখানে, কখনও সেখানে, কখনও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের থাকিবার গৃহে যাইয়া সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

সাধারণ দানগৃহে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত গোলমাল করিতেছিল। গোল শুনিয়া তিনি সেই দিকেই চলিলেন। যাহারা প্রথমেই চারি পাঁচ টাকা করিয়া পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর কিছু যাচ্ঞা করিতে-ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে আর এক টাকা করিয়া দিতে বলিলেন। সকলেই "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ অধিকারী অনেক লোকের পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাগোবিন্দের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—

"মহারাজ! আমি টাকা কড়ির প্রার্থী নহি। গত পৌষ মাসে রঙ্গপুরের যে কয়েকটি লোক কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কারামুক্তির প্রার্থনা করিতেছি।"

এই ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনিবামাত্রই গঙ্গাগোবিন্দের প্লীহা চমকিয়া উঠিল। তিনি চক্রান্ত করিয়া কোনও অভিপ্রায় সাধনার্থ ইহাদিগকে

কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীসিংহ, গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব এবং হেষ্টিংস ভিন্ন সে চক্রান্তের বিষয় অন্য কেহই কিছু জানেন না। ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন "ঠাকুর, কোনও কয়েদীকে কারামুক্ত করিবার আমার সাধ্য নাই। তুমি টাকা কড়ি যাহা কিছু চাহ, তাহা এখনই পাইবে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন "মহারাজ! আমার টাকা কড়ির প্রয়োজন নাই। রঙ্গপুরের সেই পনের * জনা লোককে কারামুক্ত করিয়া দেন। তাহাদিগের কারামুক্তিই আপনার নিকট ভিক্ষা করিতেছি।"

গঙ্গাগোবিন্দ। কাহাকেও কারামুক্ত করা আমার অসাধ্য।

রামকৃষ্ণ। আপনি সাধ্যানুসারে আজ সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সাধ্য থাকিতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে আপনার এ ব্রত ভঙ্গ হইবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিবার সাধ্য আমার নাই; তুমি যত টাকা চাহ বল, এখনই দেওয়াইতেছি।

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে আপনি টাকা দান করিয়া কেবল জলে জল ঢালিতেছেন। নদীর জল তুলিয়া আবার নদীতে ঢালিলে কোনও উপকার নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ। জলে জল ঢালিতেছি? সে কি!

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে, দেশের সমুদয় লোকের অর্থ সম্পত্তি টাকা কড়ি লুঠ করিয়া আনিয়া তাহার কিয়দংশ আজ আবার কয়েক জন লোককে দিতেছেন। নদীর জল তুলিয়া নদীতেই ঢালিতেছেন।

রামকৃষ্ণের এই কথা শুনিবামাত্র গতরাত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত আবার গঙ্গাগোবিন্দের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। কিছু কালের নিমিত্ত তিনি নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ আবার বলিলেন—"এ নদীর জল নদীতে ঢালিলে তোমার মাতার কখনও স্বর্গারোহণ হইবে না। যদি জননীর স্বর্গলাভ ইচ্ছা কর, নিরপরাধদিগকে এখনই কারামুক্ত কর।"

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে এইপ্রকারে তিরস্কার করিতে কেহ কখনও সাহস করে নাই। তিন চারি জন লোক রামকৃষ্ণকে তাড়াইয়া দিতে আসিল।

---

* Vide note (17) in the appendix.

গঙ্গাগোবিন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "আজ অভ্যাগত কোনও লোককে কর্কশ বাক্য বলিবে না। কিংবা কাহাকেও গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিবে না।"

এই বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। ছদ্মবেশী রামকৃষ্ণ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, মাতৃশ্রাদ্ধের দিন গঙ্গাগোবিন্দ নিশ্চয়ই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। অনর্থক কেবল পথপর্য্যটনে সময় নষ্ট হইল।

তিনি নিরাশ হইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এখন আর সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিতে হইলে অনেক ব্যয়ের আবশ্যক। আবার তাহাতে দুই এক মাসের মধ্যে খালাস হইবার সম্ভাবনা নাই। রঙ্গপুরের লোকেরা প্রেমানন্দের আশা-পথ চাহিয়া রহিয়াছে। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

এদিকে মাতৃশ্রাদ্ধের দুই তিন দিন পরে গঙ্গাগোবিন্দ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জিলাস্থ কলেক্টরের দেওয়ানদিগকে তাঁহাদের আপন আপন প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্যের হিসাব পাঠাইতে লিখিলেন। কিন্তু সমুদয় জিলা হইতেই কলেক্টরের দেওয়ানগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, অতি অল্প মূল্যের যৎসামান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। প্রজা এবং জমিদারগণ অনেকেই ইচ্ছা করিয়া দেওয়ান বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই সকল জিনিস পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই ইহার মূল্য লইতে স্বীকার করেন না।

কোনও কোনও কলেক্টরের দেওয়ান লিখিলেন "দেওয়ান বাহাদুরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। শ্রাদ্ধের অল্প দিন বাকী থাকিতে খবর পাইয়াছিলাম। এ জিলার সমুদয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে সময়ও ছিল না। যে অল্প কিঞ্চিৎ ফল মূল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিজের বাঁগিচা হইতেই দিয়াছি।"

কিন্তু এক এক জিলা হইতে প্রায় বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার সময় তাহার চতুর্থাংশ বরকন্দাজগণ রাখিয়াছিল। কতক অংশ দেওয়ানদিগের

গৃহেও গিয়াছিল। অথচ দেওয়ান বাবুরা অনেকেই বলিলেন যে, তাঁহাদের নিজের উদ্যান হইতে ফল মূল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কারামুক্ত।

It was in a struggle to make him (Ganga Govinda) do his duty, that, we fell under a charge of neglect of duty and disobedience of order. We were therefore divested of our Trust.
—*Evidence of Mr. Peter Moore in the trial of Hastings.*

সত্যবতী ছদ্মবেশে পুনর্ব্বার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শীত বৃষ্টি রৌদ্র কিছুই বোধ নাই। স্বামীর উদ্ধারচিন্তাই তাঁহার হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। দিবাতে বৃক্ষতলে উপবেশন, নিশিতে বৃক্ষতলে শয়ন। আহার নিদ্রা প্রায় সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা দিবাতে লজ্জা নিবারণ করিতেন, রাত্রে তাহারই অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করেন। কিন্তু ইহাতে শরীরে কোনও রোগ প্রবেশ করিল না। যখন নানা সুখ সম্পদের মধ্যে শ্বশুরের দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন, তখন এক রাত্রি দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন না করিলে, নৈশ শিশির শরীরমধ্যে রোগ আনয়ন করিত। কিন্তু আজ বার দিন পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে শয়ন করিতেছেন। কোনও রোগ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল না। বিপদ্-বর্ম্ম তাঁহার শরীরকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। চিন্তানল সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যে প্রজ্বলিত হইতেছে বলিয়াই শীতাতিশয্য অনুভূত হইতেছে না।

মাঘ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ ২১শে মাঘ। মাঘমাসের প্রথম তারিখেই রামানন্দ দেবীসিংহের লোকদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন। সেই প্রথম তারিখ হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গকুলবধূ সত্যবতী যে সকল দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য

হইতে হয়। এই একুশ দিনের কষ্ট যন্ত্রণা, এই একুশ দিনের পরীক্ষা তাঁহাকে একুশ বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়াছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রেমানন্দ গোস্বামী দুই তিন মাস হইল কাশীতে লক্ষ্মণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দিনাজপুরে পৌছিয়াই দেবীসিংহের এই সকল অত্যাচার দেখিতে পাইলেন। পরে দিনাজপুর হইতে পিতা এবং স্ত্রীর অনুসন্ধানার্থ রঙ্গপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না। রঙ্গপুরের অনেকানেক জমিদার ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছেন; তিনি তখন অনুমান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পিতা এবং স্ত্রী হয় তো কোনও শিষ্যের পরিবারের সঙ্গে একত্রে পলায়ন করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। প্রজাদিগের অত্যাচারের অবরোধ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই অত্যাচার-নিপীড়িত প্রজাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এমন কোনও লোক ছিলেন না। প্রেমানন্দের সহানুভূতি পাইয়া প্রজা এবং অনেকানেক জমিদার উৎসাহিত হইল। অনেকেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও অত্যাচারের অবরোধ করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। অনেকানেক পলায়িত জমিদারও ইঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হইলেন।

দেবীসিংহ প্রজাদিগের এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। অত্যাচারী লোক প্রায়ই অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষ হইয়া থাকে। দেবীসিংহের ন্যায় ভীরু এবং কাপুরুষ লোক বঙ্গদেশে অত্যন্ত অল্পই ছিল। প্রজাবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া দেবীসিংহ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহার মাস্‌তাত ভ্রাতা গুড্‌ল্যাড্ সাহেবও অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলেন। দুই একটা জমিদারকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত এখন তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে কাপুরুষ জমিদারের অভাব কোনও দিনই ছিল না। গৌরমোহন চৌধুরী নামে একজন জমিদার পূর্ব্বে কতবার হররাম, সূর্য্যনারায়ণ এবং ভেকধারী সিংহ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি দেবীসিংহের অনুগ্রহের প্রত্যাশায় তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক চক্রান্ত করিয়া প্রেমানন্দ এবং অপরাপর কয়েক জন লোককে ধৃত করিয়া দেবীসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহ নিবারণার্থ দেবীসিংহ ইঁহাদিগকে একেবারে কলিকাতা-জেলে পাঠাইলেন।

দেবীসিংহ যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ হইলে কি গুড্‌ল্যাড, কি গঙ্গাগোবিন্দ, কি ওয়ারেন হেষ্টিংস সকলকেই অপদস্থ হইতে হইবে। ইহারা সকলেই এ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। সুতরাং এখন এই সকল অত্যাচার কোনক্রমে প্রকাশ না হয়, তজ্জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ চক্রান্ত করিয়া দেবীসিংহের প্রেরিত এই লোকদিগকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রেমানন্দ আজ প্রায় বিশদিন পর্য্যন্ত জেলে আছেন। কারামুক্ত হইবার কোনও উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী সত্যবতীও কলিকাতা আসিয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার কোনও উপায় অবধারণ করিতে সমর্থা হইলেন না।

আজ ২১শে মাঘ। সত্যবতী এবং জগা কলিকাতাস্থ এক প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বস্থিত বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। মনে মনে পরমেশ্বরের নিকট স্বামীর কারামুক্তির প্রার্থনা করিতেছেন। শত শত লোক রাস্তার পার্শ্ব দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আফিসে যাইতেছে। একটি ভদ্র লোক অনেকানেক কাগজ পত্র হাতে করিয়া এই বৃক্ষের পার্শ্বস্থিত রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হাতের কয়েকখানি কাগজ রাস্তায় পড়িয়া গেল। ভদ্র লোকটি বরাবর চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

সত্যবতী ভদ্র লোকের হস্ত হইতে রাস্তায় কাগজ পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, জগাকে তখন লোকটির পাছে পাছে দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার কাগজখানি দিয়া আসিতে বলিলেন। জগা সেই ভদ্রলোকের পাছে পাছে দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার হাতে সেই কাগজ দিল। ভদ্রলোক কাগজ পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। নিজের হাতে যে কাগজ ছিল, তাহা খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্য হইতেই ঐ কাগজ অজ্ঞাতসারে রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল। কাগজ কয়েকখানি পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং জগাকে বলিলেন—

"বাপু! তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। এ কাগজ হারাইলে কি আর আমার রক্ষা ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আমার পরম শত্রু। সে নিশ্চয়ই আমার অপকারের চেষ্টা করিত।"

এই ভদ্র লোকটির নাম রামচন্দ্র সেন। গঙ্গাগোবিন্দকে কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর ১৭৭৫ সালে বরখাস্ত করিলে পর ফ্রান্সিস ফিলিপের অনু-

রোধে ইনিই নায়েব দেওয়ানের পদে মকরর হইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস এবং বার্‌ওয়েল, কর্ণেল্ মন্‌সনের মৃত্যুর পর, ইঁহাকে পদচ্যুত করিয়া গঙ্গা-গোবিন্দকে পুনর্ব্বার কার্য্যে বহাল করিলেন।

ইনি জগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি কোনও চাকরির প্রার্থনায় কলিকাতায় আসিয়াছ? তোমার দ্বারা আমি বড় উপকৃত হইয়াছি। তোমার কোনও প্রার্থনা থাকিলে আমার নিকট বলিতে পার।"

জগা বলিল "মশাই, আমার মনিব রামকৃষ্ণ অধিকারী ঐ গাছতলায় বসিয়া আছেন। তিনিই আপনার কাগজ রাস্তায় পাইয়া আমার দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এক জন আত্মীয়কে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জেলে রাখিয়াছেন। তাঁহার খালাসের কি কোনও উপায় বলিয়া দিতে পারেন? আমরা কোনও চাকরির প্রার্থনায় এখানে আসি নাই।"

রামচন্দ্র সেন তখন রামকৃষ্ণের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন "অধিকারী মহাশয়, আপনার ভয় নাই। আপনার সুপ্রিম কোর্টেও কোনও দরখাস্ত করিতে হইবে না। আপনার আত্মীয়ের খালাসের, আমি আজই একটা উপায় করিয়া দিব। আমার সঙ্গে রাজস্ব-কমিটীর আফিসে চলুন।"

রামকৃষ্ণ অধিকারী এবং জগা রামচন্দ্র সেনের সঙ্গে রাজস্ব-কমিটীর আফিসে আসিলেন। রামচন্দ্র পিটার মুয়র সাহেবের নিকট ইঁহাদিগের সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। পিটার মুয়র তাঁহার কথা শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দকে প্রাগুক্ত কয়েদীদিগের জেলে রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাদিগকে জেলে রাখিবার কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারিলেন না। আর প্রকৃত কারণ তাঁহার নিকট প্রকাশও করিলেন না। মুয়র সাহেব তখন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দের খালাসের পরওয়ানা বাহির করিয়া দিতে বলিলেন।

অপরাহ্ণে গঙ্গাগোবিন্দ ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট এই সকল কথা বলিলেন। হেষ্টিংস মুয়র সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। হেষ্টিংস পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রাজস্বকমিটীর সকল কার্য্যই গঙ্গা-গোবিন্দ নির্ব্বাহ করিবেন। কমিটীর মেম্বরগণের প্রতি কেবল দস্তখতের ভার থাকিবে। মুয়র সাহেব গঙ্গাগোবিন্দের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন

বলিয়াই হেষ্টিংস প্রথমতঃ তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। পরে তাঁহাকে ক্রমে সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়া ছাড়িলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

স্বামী স্ত্রী।

প্রেমানন্দ গোস্বামী এবং তাঁহার সঙ্গিগণের খালাসের পরওয়ানা লইয়া রাজস্ব-কমিটীর প্যাদা জেলে চলিলে পর, পুরুষের পরিচ্ছদধারী সত্যবতী এবং জগা তাঁহার পাছে পাছে জেলের নিকট চলিলেন। যাইবার সময় সত্যবতী জগাকে প্রেমানন্দের নিকট তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বলিতে নিষেধ করিলেন।

প্রেমানন্দ কারাগার হইতে বাহির হইবামাত্র জগা এবং সত্যবতী তাঁহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। জগাকে প্রথমতঃ প্রেমানন্দ চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সে আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেই, তাহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার নিকট, রামানন্দ গোস্বামী এখন কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। জগা এক এক করিয়া সমুদয়ই তাঁহার নিকট বলিল। কিন্তু সত্যবতীর উপদেশানুসারে রামকৃষ্ণ অধিকারী বলিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিল।

প্রেমানন্দ রামকৃষ্ণ অধিকারীকে চিনিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি যখন এত কষ্ট করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমার কোনও আত্মীয় কুটুম্ব হইবেন।

সত্যবতী অনিমিষ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্বামীর মুখাবলোকনে এই দুরবস্থার মধ্যেও যে কি অপার আনন্দের স্রোত তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা আর বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। পতিপ্রাণা সাধ্বীরা যখনই স্বামীর মুখাবলোকন করেন, তখনই তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

সত্যবতী আজ বার বৎসরের পর স্বামীর মুখাবলোকন করিলেন। বার বৎসর পর্য্যন্ত যে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন, আজ সেই মৃত স্বামীকে জীবিত দেখিতেছেন। আজ তাঁহার অন্তর যেরূপ আনন্দের হিল্লোলে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে ভাষা, বাক্য এবং কল্পনা সকলই পরাস্ত হইবে।

প্রেমানন্দ কিছুকাল পুরুষের পরিচ্ছদধারী সত্যবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"মহাশয়! আপনি অবশ্য আমাদের কোনও আত্মীয় কুটুম্ব হইবেন। বার বৎসর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কোনও আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাৎ নাই সেই জন্যই আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন "আজ্ঞে, আপনি দেশ হইতে চলিয়া গেলে পর, আপনার পিসী ঠাকুরাণী সর্ব্বদাই আপনাদের নিমিত্ত বিলাপ করিতেন। তাঁহার কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত আমি রঙ্গপুরে এবং দিনাজপুরে আপনার পিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সম্প্রতি পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে আপনার পিতা এবং স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেখানে কমলাদেবী নামে আর একটি স্ত্রীলোক আছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, আপনি কলিকাতায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তখন আপনাকে কারামুক্ত করিবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম। যে কষ্টে আপনাকে কারামুক্ত করিয়াছি, তাহা তো জগার নিকট শুনিলেন।"

প্রেমানন্দ। আমার পিসীঠাকুরাণীর সহিত আপনার কি সম্পর্ক?

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে, তিনি আমার শাশুড়ী।

প্রেমানন্দ। আমার পিস্‌তাত ভগ্নীকে আপনি বিবাহ করিয়াছেন? আমার যে কোনও পিস্‌তাত ভগ্নী আছেন, তাহাও আমি জানি না। আমার এক পিস্‌তাত ভাই ছিলেন, তাঁহার অনেক দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ। আপনার তো জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আপনার দেশ ছাড়িয়া যাইবার পর আপনার পিসতাত ভগ্নী জন্মিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এগার বৎসরের অধিক হইবে না। এই গত বৎসর মাঘ মাসে আমাদের বিবাহ হইয়াছে।

প্রেমানন্দ। আপনাকে সতের আঠার বৎসরের যুবকের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু আপনার তো বিলক্ষণ সাহস দেখিতেছি। এই অল্প বয়সেই পরোপকারার্থ আপনি এত কষ্ট স্বীকার করেন, এ বড় সুখের বিষয়।

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে, অন্তর্যামী পরমেশ্বর জানেন। আমি আপনাকে কখনও পর বলিয়া মনে করি না। তবে দেখা সাক্ষাৎ নাই।

প্রেমানন্দ। আমার জন্য আপনি বড় কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন!

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে, মালদহে সকলেই আপনাকে পরোপকারী লোক বলিয়া প্রশংসা করেন। আপনার ন্যায় পরোপকারী সম্বন্ধীর নিমিত্ত একটু কষ্ট করিয়াছি, এ আর একটা বেশী কি

জগা ইঁহাদের পরস্পরের কথা শুনিয়া আর হাসি সংবরণ করিতে পারিল না। জগাকে একটু একটু হাসিতে দেখিয়া, সত্যবতী তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে ইশারা করিলেন। কিন্তু প্রেমানন্দ তাহা দেখিতে পাইলেন না। জগা তখন স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

প্রেমানন্দ বলিলেন "মহাশয়, আপনার নিকট আমি অত্যন্ত বাধিত হইলাম। কিন্তু আমাদের এই মুহূর্ত্তেই রঙ্গপুর যাইতে হইবে। আপনি শীঘ্র শীঘ্র মালদহ যাইয়া আমার পিতা, কমলাদেবী এবং পিসী ঠাকুরাণীর নিকট আমার কারামুক্তির কথা বলিবেন। রঙ্গপুরের কার্য্যোদ্ধার হইলে পরে পাঁড়ুয়া যাইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

রামকৃষ্ণ। আপনার স্ত্রীর নিকট তো কিছু বলিতে বলিলেন না। তিনি আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?

প্রেমানন্দ। আমার পিতার নিকট যাহা যাহা বলিবেন, তাহাই তাঁহার নিকটও বলিবেন।

রামকৃষ্ণ। আপনার স্ত্রী আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন। একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন।

প্রেমানন্দ। এখন যে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারি না। নহিলে বৃদ্ধ পিতা এবং কমলাদেবীর সঙ্গে কি দেখা না করিয়া যাইতাম?

রামকৃষ্ণ। আমার এখানে আসিবার সময় আপনার স্ত্রী বারংবার আমাকে, আপনাকে সঙ্গে করিয়া, পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন।

প্রেমানন্দ। এখন একেবারেই সময়াভাব। রঙ্গপুরে যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা কিছুই জানি না। আমার পরামর্শেই তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। আমায় এখন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের চেষ্টা করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ। মালদহের মধ্য দিয়াই তো রঙ্গপুর যাইতে পারেন। তাহাতে এক দিনের অধিক আপনার বিলম্ব হইবে না।

প্রেমানন্দ। এখন এক দিন বিলম্বেও সর্ব্বনাশ হইতে পারে।

রামকৃষ্ণ। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি এক জন বিজ্ঞ লোক; আপনার নিকট আমি বালক। কিন্তু আমার বোধ হয় আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার একটুও ভালবাসা নাই। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা থাকিলে কি আর তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইতেন!

প্রেমানন্দ। কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা কি উচিত? প্রাণান্তেও লোকের কর্ত্তব্যের পথ লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে, স্ত্রীর প্রতিও তো একটা কর্ত্তব্য আছে।

প্রেমানন্দ। আছে বই কি। স্ত্রীকে রক্ষা করা, তাঁহার ভরণপোষণ করা, সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করা আমি সর্ব্বদাই আপন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রাণান্তেও সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে আমি বিরত হইব না। তবে এগার বৎসর যে বিদেশে ছিলাম, সেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে। যিনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপকারের চেষ্টা না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। সুতরাং তাঁহার কার্য্যেই এগার বৎসর বিদেশে ছিলাম। বিশেষতঃ তখন স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার পিতা এবং স্ত্রীকে এইরূপ দুরবস্থায় পড়িতে হইবে। আমার বিদেশে গমনকালে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে এক শিষ্যালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন।

রামকৃষ্ণ। মহাশয়, আমি বালক; আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয় না থাকিলেও আপনি আমার প্রধান কুটুম্ব। সুতরাং অকপটে আপনার সঙ্গে কথা বলিতেছি। যদি স্ত্রীর প্রতি আপনার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিত, তবে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া কখনও যাইতেন না।

প্রেমানন্দ। স্ত্রীর প্রতি যেরূপ আসক্তি লোককে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করে, লোককে ভোগাসক্ত করে, লোককে স্বার্থপর করে, সে আসক্তি না থাকাই ভাল। স্ত্রীর প্রতি আমার সেরূপ আসক্তি নাই। আমি স্ত্রীর নিমিত্ত সেরূপ প্রমত্ত নহি।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, স্বামীকে সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যের পথে পরিচালন করেন, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি থাকিলে, বোধ হয় কখনও কর্ত্তব্যসাধনের বাধা পড়ে না।

কোনও স্বার্থপরায়ণা রমণীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি হইলে লোক ক্রমে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে।

প্রেমানন্দ। সহৃদয় স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, সেরূপ স্ত্রী এ সংসারে বড়ই দুর্ল্লভ। সেরূপ সহধর্ম্মিণী যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং দাম্পত্য প্রণয় তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালন করে।

রামকৃষ্ণ। তবে আপনার ভাগ্যে সেরূপ স্ত্রী জুটে নাই বলিয়াই, স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা নাই!

প্রেমানন্দ। এখন এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিবার উপযুক্ত সময় নহে। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিন।

রামকৃষ্ণ। অবশ্য এই সকল কথাবার্ত্তা বলিবার এ উপযুক্ত সময় নহে। কিন্তু আপনার স্ত্রীর অনুরোধটা আমি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তিনি বারংবার আমাকে আপনার মনের অবস্থা জানিতে বলিয়াছিলেন। আপনার কথার আভাসে এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা নাই। আপনি মনে করেন যে, তিনি আপনার সকল কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সুতরাং আপনি তাঁহাকে ভালবাসেন না।

প্রেমানন্দ। আমি তাঁহাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার সকল কার্য্যে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থা। তা আমাদের দেশের পুরুষেরাই আমার কার্য্যে কোনও সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; তিনি স্ত্রীলোক, তাঁহার আর কি দোষ দিব?

রামকৃষ্ণ। এখন যদি আপনার স্ত্রী আপনার সকল কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে ভালবাসিবেন?

প্রেমানন্দ। এই সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিন। আমি রঙ্গপুরের ভাবনায় অস্থির হইয়াছি। এই সকল কথা এখন বড় ভাল বোধ হয় না।

রামকৃষ্ণ। বার তের বৎসর পূর্ব্বে আপনি নাকি আপনার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার সকল কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলে, তিনি আপনার একমাত্র আরাধ্যা দেবী হইবেন?

প্রেমানন্দ এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ অধিকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার স্ত্রীর নিকট এ কথা মালদহে

থাকিতে অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু এ যুবক এ কথা কি প্রকারে জানিতে পারিল?

রামকৃষ্ণ বলিলেন "মহাশয়! আশ্চর্য্য হইলেন কেন? আপনার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আপনার স্ত্রী যখন আপনার নিমিত্ত বিলাপ করিতেন, তখন এই সকল কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত।"

প্রেমানন্দ ভাবিলেন যে, এ কথা মিথ্যা নহে। আমার স্ত্রী আমার শোকে বিহ্বল হইয়া, বিলাপ এবং পরিতাপ করিবার সময় এই সকল কথা বোধ হয় বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আমি বারংবার আপনাকে অনুরোধ করি, এই সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিন। আমি রঙ্গপুরের চিন্তায় অস্থির আছি। আমি আপনার নিকট হইতে এখন বিদায় চাই। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকারে আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আপনার নিকট দৃশ্যতঃ অকৃতজ্ঞ হইতে হইল।"

রামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া, প্রেমানন্দের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই বার বৎসরের পর আপনার ন্যায় সম্বন্ধীকে পাইয়া এখনই বিদায় দিতে পারি না। একান্ত যদি আপনি এখনই রঙ্গপুর রওনা হইতে চাহেন, তবে দুই এক দিনের পথ না হয় আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। আপনার সঙ্গে রঙ্গপুর পর্য্যন্তই যাইতাম। কিন্তু আপনার পিতার অত্যন্ত ব্যারাম। আমাকে সত্বরই পাঁড়ুয়ায় যাইতে হইবে।"

প্রেমানন্দ ভাবিতে লাগিলেন যে, এ তো বড় বিপদেই পড়িলাম। ইহাকে সঙ্গে করিয়া রঙ্গপুর চলিলে, পথে পথে কেবল স্ত্রীর বিষয়ে গল্প করিয়াই আমাকে ত্যক্ত করিবে। তরুণবয়স্ক যুবক, কেবল ঐ সকল বিষয়ে রসিকতা করিতেই ভালবাসে। বিশেষতঃ সম্পর্কে আমি ইহার শ্যালক, তাই কেবল বাঁদরামি করিতেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন যে, আপনি যদি পাঁড়ুয়া যাইয়া আমার বৃদ্ধ পিতার এই দুরবস্থার সময়ে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, তবে আমার বড় উপকার হইবে। আপনি অতি অল্পবয়স্ক যুবক। রঙ্গপুরে এখন যুদ্ধ হইবে। সেখানে আপনার যাওয়া উচিত নহে।

রামকৃষ্ণ। রঙ্গপুরে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে আমার যাওয়া উচিত নয় কেন? আপনি যে যাইতেছেন!

প্রেমানন্দ। আমি এখন প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও ভয় করি না। আপনি অল্পবয়স্ক যুবক। আপনি কেন অনর্থক সেখানে যাইয়া বিপদে পড়িবেন?

রামকৃষ্ণ। আমিও আপনার সঙ্গে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি। এমন সম্বন্ধীর সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ভয় কি? মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইয়া দুই জনে একত্রে বসিয়া গল্প করিব।

প্রেমানন্দ ভাবিতে লাগিলেন যে, এ তো বড় বকা ছেলে! কিন্তু ইহাকে যেরূপে হয় এখনই বিদায় করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি জগাকে ডাকিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, জগাকে শীঘ্র শীঘ্র পাঁড়ুয়া যাইতে বলিলে, এ বকা ছেলেও বাধ্য হইয়া জগার সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়ুয়া চলিয়া যাইবে।

কিন্তু সত্যবতী প্রেমানন্দের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন "আপনি একান্তই যদি আমার নিকট হইতে বিদায় লইতে চাহেন, তবে কাণে কাণে একটা কথা শুনিয়া চলিয়া যান। আপনার স্ত্রী এই কথাটা আপনার নিকট বলিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া প্রেমানন্দের কাণের নিকট মুখ রাখিয়া চুপে চুপে দুই এক কথা বলিবামাত্রই, প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠিয়া রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

পুরুষের পরিচ্ছদধারী সত্যবতী তখন হস্ত দ্বারা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "নাথ! পূর্ব্বে অজ্ঞানতা বশতঃ সময় সময় তোমার সদনুষ্ঠানে বাধা দিয়াছি। সময় সময় তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু বিপদে পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই দেবতা। এখন হইতে ছায়ার ন্যায় তোমার পদানুসরণ করিব। তোমার সকল সদনুষ্ঠানের সাহায্য করিব। তোমার সকল কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিব। এ চির-অপরাধিনীর পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

স্ত্রীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া প্রেমানন্দের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সত্যবতী স্বামীর গলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক্। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

কিছুকাল পরে জগা ইঁহাদের নিকট আসিলে, প্রেমানন্দ সত্যবতীকে বলিলেন, "তোমাকে পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে রাখিয়াই আমায় রঙ্গপুর যাইতে হইবে। কিন্তু পদব্রজে গমন করিতে হইবে। আমার ভয় হয়, তুমি তত শীঘ্র চলিয়া যাইতে পারিবে কি না!"

সত্যবতী বলিলেন "নাথ! সে বিষয়ে তোমার কোনও চিন্তা নাই। বিপদ্ শরীরকেও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ করিয়াছে। আমি তিন দিন তিন রাত্রে এখানে আসিয়াছি। পাঁড়ুয়ার জঙ্গল হইয়া রঙ্গপুর গেলে তোমার বিলম্ব হইবে না। রঙ্গপুরের লোকেরা পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে তোমার নিমিত্ত অশ্ব রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং সমস্ত পথ হাঁটিয়া যাইতে যে সময় লাগিবে, তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে পাঁড়ুয়া হইয়া রঙ্গপুর যাইতে পারিবে। তোমার পিতার এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। তাঁহার সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করিয়া না গেলে, বোধ হয় আর তোমাদের পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইবে না।"

ইহার পর প্রেমানন্দ, তাঁহার সঙ্গী অপর চৌদ্দজন লোক এবং সত্যবতী আর জগাকে সঙ্গে করিয়া, মালদহের দিকে চলিলেন। ইঁহারা দুই দিন দুই রাত্রির মধ্যে পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

আসন্ন কালের চিন্তা।

সত্যবতী কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর, কমলাদেবী এবং রূপা প্রাণপণে বৃদ্ধ রামানন্দ গোস্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামানন্দের পরমায়ু একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেবীসিংহের বরকন্দাজদিগের প্রহারে সেই দিনই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইত। কেবল চিরসুস্থ শরীর বলিয়াই আজ পর্য্যন্তও তিনি জীবিত আছেন।

রামানন্দ এখন কেবল আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন; প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রূপাকে এবং কমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করেন "বউমা আমার বাছাকে লইয়া আসিয়াছেন?" কুটীরের নিকটে কোনও বৃক্ষপত্র পতিত হইলেই পদসঞ্চারের শব্দ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ রূপাকে বাহিরে যাইয়া কে আসিতেছে দেখিতে বলেন। রূপা বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বলে "কেহ নহে," তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলেন "আমার প্রেমানন্দের সঙ্গে বুঝি আর দেখা হইবে না!"

কমলাদেবী অনেক সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন "আপনার ভয় নাই, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।"

* * * * *

আজ ২৪শে মাঘ। চব্বিশ দিন হইল রামানন্দ দেবীসিংহের বরকন্দাজগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রহৃত হইয়াছেন। গত কল্য হইতেই তাঁহার জীবনের আশা একেবারে শেষ হইয়াছে। রূপা গত কল্য গৌড়ে রামানন্দের স্বগ্রামে যাইয়া তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। ইঁহারা কেহ কেহ রামানন্দ গোস্বামীকে এই অবস্থায় তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু কমলাদেবী সে প্রস্তাবে সম্মত নহেন।

এখনও রামানন্দের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। তিনি সম্মুখস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে বউমা এবং প্রেমানন্দ আসিয়া না পৌঁছিলে, তাঁহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়াও আমার ঋণ পরিশোধ করিতে বলিবেন। আমার মৃত্যুর পর আমার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যেন ঋণ পরিশোধ হয়। ঋণাবস্থায় কাহারও শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে কোনও ফল হয় না। আর আমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে একখণ্ড কাগজ আছে। সেই কাগজে যে সকল কথা লিখিত রহিয়াছে, তাহাই আমার সমাধি-স্তম্ভে লিখিয়া রাখিতে হইবে।"

রামানন্দের সকল কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কুটীরের নিকট অনেক লোকের পদসঞ্চারের শব্দ শুনা গেল। রূপা বাহির হইয়া দেখে যে, সত্যবতী, প্রেমানন্দ, জগা এবং অন্যান্য তের চৌদ্দ জন লোক কুটীরের দিকে আসিতেছেন। সে তখন দৌড়িয়া কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল "প্রেমানন্দ ঠাকুর আসিয়াছেন!"

রামানন্দ এই কথা শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। আকস্মিক হর্ষ প্রযুক্ত একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উত্থানশক্তি একেবারেই রহিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাচ এখন উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রূপা তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া উঠাইল। প্রেমানন্দ এবং সত্যবতী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রেই রামানন্দ গোস্বামী বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু হস্ত উঠাইবার বড় সাধ্য নাই। প্রেমানন্দ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার

চরণদ্বয় ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। সত্যবতী অপর পার্শ্বে যাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই সময় গৃহস্থিত সকলেই কিছু কালের নিমিত্ত নির্ব্বাক্ ছিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। পিতা পুত্র উভয়ের চক্ষের জল পড়িতে দেখিয়া, সকলের চক্ষু হইতেই অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে রামানন্দ অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে একেবারে অচৈতন্য হইলেন। তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। তখন প্রেমানন্দ তাঁহাকে রূপার ক্রোড় হইতে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। সত্যবতী অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিবার নিমিত্ত কুটীরে একখানি তালবৃন্তও ছিল না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আবার রামানন্দের চৈতন্য হইল। কিন্তু শরীরে একেবারেই বল নাই। অতি কষ্টে এবং ভগ্ন স্বরে পুত্র এবং পুত্রবধূকে বলিতে লাগিলেন—"বাছা! আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া চলিলাম। ঋণমুক্তির কি করিবে?"

সত্যবতী। (সজলনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি আত্মবিক্রয় করিয়াও আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। আমি রাণী ভবানীর গৃহে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাকে ঋণের দায় হইতে উদ্ধার করিব।

প্রেমানন্দ তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার নিকট ঋণী হইয়াছেন?"

সত্যবতী। জীবনের মধ্যে সেই একবার ভিন্ন আর কখনও টাকা কর্জ্জ করেন নাই। দুর্ভিক্ষের বৎসর পূর্ণিয়ার ব্রহ্মত্রের জন্য দেবীসিংহ খাজনা দাবী করিয়াছিল। তখন রাণী ভবানীর নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। সেই ভিন্ন আর কোনও ঋণ নাই।

রামানন্দ ঋণের কথা বলিয়াই আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রেমানন্দ তখন পিতাকে চেতন করিবার নিমিত্ত ডাকিতে লাগিলেন—

"বাবা! বাবা!"

কোনও উত্তর নাই,

"বাবা! বাবা! ঋণের নিমিত্ত আপনি কেন এত কষ্ট বোধ করিতেছেন? আমি যেরূপে পারি আপনাকে অঋণী করিব।"

রামানন্দ। (অতি ক্ষীণস্বরে) কেমন ক'রে—কো—থা—য়—টাকা—পা—বে?

প্রেমানন্দ। আমি রঙ্গপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।

রামানন্দ। ব—ড়—দেরী—হ—বে—বার—বৎ—সরের—ঋণ।

সত্যবতী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা ! আমাকে ফেলিয়া চলিলে ? তুমি স্বর্গে চলিয়া গেলে, আমি মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, তোমার ঋণ পরিশোধার্থ রাজসাহী চলিয়া যাইব। আমি রাণী ভবানীর ঘরে দাসী হইয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।

রামানন্দ। ঋণী—র—স্ব—র্—গ—নাই।

প্রেমানন্দ। ঋণের চিন্তা আপনি পরিত্যাগ করুন। যেরূপে পারি আমি ঋণ পরিশোধ করিব।

রামানন্দ। সে—কা—গ—জ—

প্রেমানন্দ এবং সত্যবতী রামানন্দের এই কথার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না। তখন কমলাদেবী বলিলেন, "কিছু কাল হইল ইনি বলিয়াছেন, ইঁহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কি একখানা কাগজ আছে। সেই কাগজে যাহা লিখিত আছে, তাহাই সমাধিস্তম্ভে লিখিয়া রাখিতে হইবে।"

রামানন্দের ভিক্ষার ঝুলি সত্যবতী প্রাণনগরের কুটীর হইতে পলায়নকালে সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন। সেই ঝুলি হইতে একখণ্ড হরিদ্রাবর্ণের কাগজ বাহির করিলেন। প্রেমানন্দ সে কাগজ পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—

"পাপাত্মা দুর্ম্মতি রামানন্দ গোস্বামী আত্মরক্ষার্থ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সে কেবল আত্মবিনাশের পথ। সমাজস্থ অত্যাচারনিপীড়িতদিগকে অত্যাচারীর নিষ্ঠুরাচরণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ না করিলে, এ সংসারে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। যদি কেহ আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে রামানন্দের সুপুত্র প্রেমানন্দের ন্যায় সমাজব্যাপ্ত পাপ ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হও। দুর্ম্মতি রামানন্দ গোস্বামীর দান, ধর্ম্ম, সদাব্রত এবং অতিথিশালা কিছুই তাহাকে বর্ত্তমান সমাজব্যাপ্ত অত্যাচারানলসম্ভূত দাবাগ্নি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। মূঢ়মতি পাপাত্মা রামানন্দের শেষ কালের এই দুরবস্থার ইতিহাস পাঠ করিয়াও, যদি তোমার [illegible]োদয় না হয়, তোমার নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তোমার মোহান্ধকার দূর না [illegible] তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই মনুষ্যাত্মা নাই। তুমি রামানন্দের

ন্যায় ভ্রম-জালে জড়িত হইয়াছ। রামানন্দের ন্যায় চরমে কষ্টভোগ করিবে।”

প্রেমানন্দ এই কাগজখানি পাঠ করিবামাত্র সত্যবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

“আমার শ্বশুর পুণ্যাত্মা—আমার শ্বশুর ধার্ম্মিক। আমার শ্বশুরের সমাধি-স্তম্ভে কখনও ‘পাপাত্মা’ ‘দুর্ম্মতি’ লিখিতে দিব না।”

তখন প্রেমানন্দ পাপাত্মা শব্দ কাটিয়া, সেখানে “পুণ্যাত্মা” শব্দ, দুর্ম্মতি শব্দ স্থানে “সদাচারী” এবং মূঢ়মতি শব্দের স্থানে “পরমবৈষ্ণব” শব্দ বসাইয়া দিলেন।

ইহার পর রামানন্দ ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। আর কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। সত্যবতী তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া হরি-নাম বলিতে লাগিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর মুখের দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরমবৈষ্ণব রামানন্দ নয়ন মুদ্রিত করিলেন। এই ঘোর-অত্যাচার-পরিপূর্ণ নরকসদৃশ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রামানন্দ স্বর্গারোহণ করিলেন।

মৃত্যুর পর প্রেমানন্দ সত্যবতীকে বলিলেন “আমি এখনই রঙ্গপুর চলিয়া যাইব, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্তও বিলম্ব করিব না। আমার উত্তেজনায় রঙ্গপুরের প্রজা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে। আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তুমি বিগত ১২ বার বৎসর পর্য্যন্ত পিতার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ। তুমিই ধন্য! পিতার মুখানল এবং শ্রাদ্ধাদি সকল তুমিই করিবে। তুমি আমি একাঙ্গ এবং একাত্মা। তুমি শ্রাদ্ধ করিলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান [illegible] আমি জীবিত থাকিতে গত দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার পি[illegible] কষ্টভোগ করিয়াছেন, এ দুঃখ আমার হৃদ[illegible] মাতাকে লইয়া [illegible] হইবে না। উপস্থিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত [illegible] লইয়া তোমরা এখন গৌড়ে চলিয়া যাও। আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে আমার জননীর সমাধিস্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে পিতার সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে। এবং অনতিবিলম্বে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া এই কাগজের লিখিত কথা কয়েকটি সমাধিস্তম্ভে লিখিয়া রাখিবে।”

এই বলিয়া প্রেমানন্দ রঙ্গপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রামানন্দের

মৃত দেহের সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতী, কমলাদেবী, রূপা, জগা গৌড়ে চলিল। রামানন্দের আত্মীয় ব্রাহ্মণগণ মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে সত্যবতী রামানন্দের সমাধিস্তম্ভে এইরূপ লিখিয়া রাখিলেন ঃ—

সমাধিস্তম্ভ।

পুণ্যাত্মা সদাচারী রামানন্দ গোস্বামী
আত্মরক্ষার্থ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন,
সে কেবল আত্মবিনাশের পথ।

সমাজস্থ অত্যাচারনিপীড়িতদিগকে
অত্যাচারীর নিষ্ঠুরাচরণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত,
আত্মোৎসর্গ না করিলে
এ সংসারে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

যদি কেহ আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর,
তবে রামানন্দের সুপুত্র প্রেমানন্দের ন্যায় সমাজব্যাপ্ত
পাপ ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হও।

ধর্ম্মাত্মা রামানন্দ গোস্বামীর
দান, কর্ম্ম সদাব্রত এবং অতিথিশালা কিছুই তাঁহাকে বর্ত্তমান
সমাজানন্দের [illegible]ানলসম্ভূত দাবাগ্নি হইতে
রক্ষা করিতে [illegible]।

পরম বৈষ্ণব রামানন্দের
শেষ কালের এই দুরবস্থার ইতিহাস পাঠ করিয়াও
যদি তোমার জ্ঞানোদয় না হয়,
তোমার নিদ্রাভঙ্গ না হয়,

তোমার মোহান্ধকার দূর না হয়,
তবে তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই মনুষ্যাত্মা নাই,
তুমি রামানন্দের ন্যায় ভ্রমজালে পতিত হইয়াছ
রামানন্দের ন্যায় চরমে কষ্ট ভোগ করিবে।
১১৮৯ সনের ২৪শে মাঘ,
জানুয়ারী ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ
সত্যবতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ঋণমুক্ত।

রামানন্দের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার পর সত্যবতী শ্বশুরের ঋণ পরিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কমলাদেবীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ঋণের পরিবর্ত্তে শ্বশুরের পৈতৃক বসত বাড়ী রাণী ভবানীকে কবলা করিয়া দিবেন। বসত বাড়ী হইতে তাঁহারা এখন পর্য্যন্তও বেদখল হয়েন নাই। কিন্তু বসত বাড়ীর মূল্য দ্বারা যদি সমগ্র ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে প্রেমানন্দের ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি রাণী ভবানীর গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিবেন।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সত্যবতী রূপাকে লইয়া নাটোরে চলিলেন। জগা এবং কমলাদেবী তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত রামানন্দের মালদহের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সত্যবতী দুই তিন দিনের মধ্যেই নাটোর পৌছিয়া রাণী ভবানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধান একখানি জীর্ণ বস্ত্র। এইরূপ কাঙ্গালিনীর বেশে রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বারবান্‌গণ অবজ্ঞা করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি প্রথমতঃ রাজবাড়ীর

নিকটবর্ত্তী একটী স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোকটীর দ্বারা রাণী ভবানীর নিকট খবর পাঠাইলেন।

রামানন্দ গোস্বামীর নাম রাণী ভবানীর নিকট অপরিচিত ছিল না। রামানন্দকে রাণী ভবানী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং রামানন্দের পুত্রবধূ বিপদে পড়িয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনয়নার্থ একখানা পাল্কী এবং তিন চারিজন দাসী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রেরিত দাসীগণ সত্যবতীকে এইরূপ কাঙ্গালিনীর বেশে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

সত্যবতী মালদহ হইতে পদব্রজে নাটোর আসিয়াছেন। তাঁহার পাল্কীর বড় প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাছে রাণী অসন্তুষ্ট হন, সেই জন্যই অনিচ্ছা পূর্ব্বক পাল্কী আরোহণে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাণী তাঁহাকে সস্নেহ এবং সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলেন।

রাণী ভবানী তাঁহাকে জীর্ণ-মলিনবস্ত্রপরিহিতা দেখিয়া, তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সত্যবতী ১৭৭১ সালে প্রেমানন্দ দেবীসিংহের লোকদিগ-কর্ত্তৃক ধৃত হইবার পর বিগত চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি যতপ্রকার বিপদ্ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এক এক করিয়া রাণীর নিকট বলিলেন। পরমদয়াবতী কোমলহৃদয়া রাণী ভবানী তাঁহার এই সকল বিপদের কথা শুনিয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সত্যবতী যে উদ্দেশ্যে রাণীর নিকট আসিয়াছেন, তাহা বলিবামাত্র রাণী সক্রোধে বলিলেন—

"বাছা! আমাকে কি রামানন্দ গোস্বামী চণ্ডালিনী বলিয়া মনে করিতেন?"

সত্যবতী। আপনাকে তিনি পরমারাধ্যা দেবকন্যা বলিয়া জানিতেন।

রাণী। তাহা হইলে এই দুরবস্থার সময় তোমরা ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইতে না। বিশেষতঃ আমি তো রামানন্দ গোস্বামীর নিকট হইতে এই টাকা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব বলিয়া কখনও মনে করি নাই।

সত্যবতী। তিনি টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া আপনার প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি এ টাকা গ্রহণ না করিলে তিনি চিরকাল ঋণী থাকিবেন।

রাণী। আমি দান করিয়া সেই টাকা গ্রহণ করিলে আমাকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে।

সত্যবতী। আপনি কি দান বলিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন?

রাণী। বাছা! সে দুর্ভিক্ষের বৎসর অনেকানেক জমিদারের রাজস্ব আদায় দিবার সাধ্য ছিল না। অর্থগৃধ্নু কোম্পানির লোকেরা সকল জমিদারের দেয় রাজস্ব তলপ করিল। জমিদারদিগকে ধমকাইতে লাগিল যে, তাঁহারা রাজস্ব আদায় না দিলে, তাঁহাদিগকে আপন আপন পৈতৃক জমিদারী হইতে উৎখাত করিবে। আমি তখন আপন জমিদারীর রাজস্ব আদায় না দিয়াও অন্যান্য জমিদারের জমিদারী রক্ষার নিমিত্ত, কাহাকেও দশ হাজার, কাহাকেও বিশ হাজার, কাহাকেও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছিলাম। তাহাতেই অনেকানেক জমিদারের জমিদারী রক্ষা হইল। কিন্তু আমার নিজের বাহিরবন্দ পরগণার রাজস্ব আদায় হইল না। কোম্পানি আমাকে বাহিরবন্দ পরগণা হইতে উৎখাত করিলেন *। আমার নিজের সেই এক পরগণার জমিদারী গিয়াছে বলিয়া, আমার কোনও কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু অনেকানেক গরিব জমিদার এবং ব্রহ্মত্র জমির মালিক যে আপন আপন পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আমার সুখের বিষয়। সে বৎসর যাহাকে যাহাকে টাকা দিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে সেই টাকা আর গ্রহণ করি নাই। রামানন্দ গোস্বামীকে টাকা প্রদান করিবার সময় তাঁহার নিকট হইতে এই টাকা পরিশোধ লইব বলিয়া, আমি কখনও মনে করি নাই। সুতরাং তিনি কোনক্রমেই আমার নিকট ঋণী নহেন।

সত্যবতী। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি খত দিয়া টাকা নিয়াছেন। এ টাকা অবশ্য তিনি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাণী। আমি তাঁহাকে কখনও খত দিতে বলি নাই। তিনি খত দিতে চাহিলে আমি বারংবার তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গোস্বামীর পাগলামি হয় তো তোমাদের অবিদিত নাই। খত না লইলে তিনি টাকা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন অগত্যা আমি বলিলাম "আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা লিখিয়া দেন।" তিনি একখানা কাগজে লিখিয়া দিলেন—"ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপনার নিকট হইতে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিলাম।"

* Vide note (1) in the appendix.

সত্যবতী। তবে তো তিনি ঋণ বলিয়াই টাকা নিয়াছেন। তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধার্থ আমাদের বসত বাড়ী কবলা করিয়া দিব। আর আমি নিজে পরিচারিকা হইয়া আপনার গৃহে থাকিব।

রাণী। তোমার ইচ্ছা হইলে এই বিপদের সময় আমার গৃহেই থাক। আমি আপন কন্যার ন্যায় তোমাকে আপন গৃহে রাখিব। আমার পুত্রবধূ তোমার পরিচর্য্যা করিবেন।

সত্যবতী। আমি শ্বশুরের মৃত্যুশয্যায় অঙ্গীকার করিয়াছি, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিব। তাঁহার ঋণ পরিশোধ না করিলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হইবে।

রাণী। গোস্বামীর ঋণ থাকিলে তো পরিশোধ করিবে? তিনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমার টাকা নিয়াছিলেন। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি কখনও তাঁহাকে ঋণস্বরূপ সে টাকা দিই নাই। তিনি কখনও আমার নিকট ঋণী নহেন। তুমি এখনও যদি সে টাকা ঋণ বলিয়া মনে কর, তবে আবার আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, রামানন্দ গোস্বামীকে আমি সকল ঋণ হইতে মুক্ত করিলাম।

সত্যবতী। টাকা না পাইয়াই ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিলেন?

রাণী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তাঁহার পরম পুণ্যবতী পুত্রবধূ, যিনি পুণ্য-বলে আপন শ্বশুর এবং স্বামীকে কারামুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার পদধূলির মূল্যের পরিবর্ত্তে ঋণদায় হইতে রামানন্দকে অব্যাহতি দিলাম।

রাণী ভবানীর এই সকল স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যবতীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রাণীর অনুরোধে তিন দিন সেখানে অবস্থান করিলেন। রাণী ভবানী তাঁহাকে সস্নেহে স্বীয় পুত্রবধূ রাণী সর্ব্বাণীর সঙ্গে একাসনে বসাইতেন, একত্রে আহার করাইতেন। ঠিক পুত্রবধূর ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিন দিন পরে অনেক ধন রত্ন সঙ্গে দিয়া সত্যবতীকে পাল্কী করিয়া মালদহে পাঠাইয়া দিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মোগলহাটের যুদ্ধ।

প্রেমানন্দ গোস্বামী পিতৃবিয়োগের পর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহণে রঙ্গপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রঙ্গপুরের অত্যাচার-নিপীড়িত প্রজাগণ ৭ই মাঘ হইতেই দেবীসিংহের লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রঙ্গপুর দিনাজপুরে যত বরকন্দাজ এবং সিপাহী ছিল, তাহারা প্রায় সমুদায়ই প্রেমানন্দের রঙ্গপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রজাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।

রঙ্গপুরের কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব এখন অনন্যোপায় হইয়া লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রজাগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে পরাস্ত করা লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের পক্ষে বড় দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন সুবুদ্ধি গুড্‌ল্যাড্‌ তাঁহার পাঁচ নম্বর হুকুমনামা বাহির করিলেন *। এই হুকুমনামার বলে লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্‌ যাহাকে ধৃত করিতেন, তাহারই প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। আর যে গ্রামে যাইতেন, সে গ্রামের সমুদয় কৃষক এবং কুলিদিগের ঘর জ্বালাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেমানন্দের পরামর্শে যে সকল গ্রামের প্রজা দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের কিছুই হইল না; কিন্তু অনেকানেক নিরপরাধ কুলি এবং কৃষক নিহত হইল, এবং তাহাদিগের ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হইল।

প্রেমানন্দ রঙ্গপুরের এক একটী গ্রাম পার হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কৃষক এবং কুলিদিগের গৃহের চিহ্নও নাই। গ্রামের যে সকল স্থানে গৃহাদি ছিল, এখন সেখানে স্তূপাকারে ভস্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত না হইলে, কখনও এইরূপ অবস্থা হইত না। অনর্থক লোকের প্রাণবিনাশ করিতে তিনি কাহাকেও পরামর্শ দেন নাই। তিনি যুদ্ধার্থীদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যাহারা আপন আপন স্বার্থের

---

* Vide note (18) in the appendix.

অনুরোধে, রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে কিংবা পদ প্রভুত্ব লাভ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করে, তাহারা আততায়ীদিগের ন্যায় সহস্র সহস্র নরহত্যা করিয়া স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করে, মানবমণ্ডলীর ঘোর অনিষ্টসাধন করে, এবং চরমে তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, জনবিশেষের স্বাধীনতা রক্ষার্থ এবং দেশপ্রচলিত অত্যাচারের অবরোধ করিয়া সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ যাঁহারা অস্ত্রধারণ করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কখনও নরহত্যা করেন না, সমুদয় মানবমণ্ডলীর মঙ্গলসাধনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং যেপরিমাণ বল প্রয়োগ করিলে অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করিয়া কখনও পশুবৎ আচরণ করেন না।

কিন্তু অশিক্ষিত প্রজাগণ তাঁহার এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। সুতরাং এক দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা যদ্রূপ পশুবৎ আচরণ করিয়া অনেকানেক নিরপরাধ লোকের প্রাণবিনাশ করিতেছিল, পক্ষান্তরে রঙ্গপুরের প্রজাগণও তদ্রূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বরকন্দাজ এবং সিপাহীদিগের প্রাণবধ করিতে লাগিল।

প্রেমানন্দ রঙ্গপুর পৌঁছিয়া মোগলহাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে নুরাল মহম্মদ এবং দয়ারামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নুরাল মহম্মদ নবাব উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। দয়ারাম নুরাল মহম্মদের দেওয়ান হইয়া দেশের অন্যান্য প্রজাগণ হইতে যুদ্ধের খরচা আদায় করিতেন।

ইঁহারা প্রেমানন্দকে পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ আসিয়া ইঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। নুরাল মহম্মদের পক্ষের অধিকাংশ লোকই পাটগ্রামে ছিল। এই সময় কলেক্টর গুড্‌ল্যাডের সঙ্গে ইঁহাদের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সুতরাং মোগলহাটে পঞ্চাশ জন লোকের অধিক ছিল না। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ সংগ্রামার্থ ইঁহাদিগের নিকট আসিবামাত্র, ইঁহারা নিঃশঙ্কহৃদয়ে সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। অত্যল্প অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রায় চারি ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকসংখ্যার ন্যূনতা প্রযুক্ত অবশেষে ইঁহাদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। ইঁহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা সম্মুখসংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করিয়া, ইঁহাদের

মধ্যে একজন লোকও পলায়ন করিলেন না। দয়ারাম এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মুরাদ মহম্মদ আহত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। প্রেমানন্দ অন্যান্য লোক সহ সায়ংকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন। উভয় পক্ষেরই অনেক লোক হত এবং আহত হইয়াছিল। সুতরাং সন্ধ্যার পর অন্ধকার হইবামাত্র যুদ্ধ ভঙ্গ হইল। প্রেমানন্দ আট জন লোক লইয়া পাটগ্রামে চলিয়া গেলেন।

পাটগ্রামের সৈন্যগণ মোগলহাটের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেমানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই, জয় পরাজয় উভয়ই আমাদের সমান। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। দেশপ্রচলিত অত্যাচার নিবারণ করিয়া সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেও, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেবীসিংহের ন্যায় নরপিশাচকে রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়া আর প্রজার উপর অত্যাচার করিতে কখনও সাহস করিবে না। যে অত্যাচার নিবারণার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম, সে অত্যাচার বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দুঃখের কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু আমরা যদি সংগ্রামার্থ প্রস্তুত না হইতাম, তবে এ অত্যাচারের স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইত। চিরকাল দেবীসিংহের কারাগারে শত শত প্রজার প্রাণ বিনাশ হইত, শত শত কুলধর্ম্ম নষ্ট হইত।

"এই ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ যাঁহারা সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে। ভাবী বংশাবলী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। এই অনিত্য দেহ সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ যাঁহারা বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা।"

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পাটগ্রাম-কলঙ্ক।

প্রেমানন্দ পাটগ্রাম পৌঁছিয়াই মনে করিলেন যে, মোগলহাটের যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ হইবে না। তাঁহার এইপ্রকার মনে করিবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব বারংবার পরওয়ানা দ্বারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রজাগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে আর তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার হইবে না; ১১৮৭ সনে তাহারা যে নিরিখে খাজনা দিয়াছিল, তদপেক্ষা উচ্চতর নিরিখে তাহাদিগের নিকট কেহ খাজনা দাবী করিতে পারিবে না; আর কখনও কোনপ্রকারের আব্‌ওয়াব কি মাথুট দিতে হইবে না।

এই সকল পরওয়ানা জারি হইতে দেখিয়া প্রেমানন্দ প্রায় সমুদয় প্রজা-দিগকে বিদায় দিলেন। কেবলমাত্র আশী নব্বই জন লোক তাঁহার সঙ্গে পাটগ্রামে ছিল।

কিন্তু মোগলহাটের যুদ্ধের দুই দিন পরে ১৭৮৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিপাহীগণ বস্ত্রের নীচে অস্ত্র শস্ত্র লুকাইয়া, বরকন্দা-জের বেশে ইঁহাদিগের নিকট আসিতে লাগিল।* প্রেমানন্দ এবং তৎপক্ষীয় লোকেরা মনে করিলেন যে, ইহারা গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের পরওয়ানা লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ক্রমে একজন দুইজন করিয়া, অনেক লোক আসিয়া একত্র হইল।

প্রেমানন্দের পক্ষের লোকদিগের নিকট তখন অস্ত্র শস্ত্র কিছুই ছিল না। সিপাহীগণ বরকন্দাজের বেশে আসিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রেমা-নন্দ অন্যান্য সমুদয় লোককে পলায়ন করিতে বলিয়া নিজে সংগ্রামক্ষেত্রে মুরাল মহম্মদের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি আপন অনুগত লোকদিগকে বলিলেন "তোমরা পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা কর, কিন্তু আমি কখনও পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিব না।"

তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

"আমাদের নেতাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও আত্মরক্ষা করিব না।"

---

* Vide note (19) in the appendix.

এই বলিয়া সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ইহারা সকলেই বলিতে লাগিল "দেবীসিংহের কারাগারেই তো পচিয়া মরিতাম। কিন্তু যাঁহার সৎপরামর্শ এবং উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণ দেবীসিংহের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, যাঁহার সৎ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ভবিষ্যতে জননী, স্ত্রী, ভগ্নী এবং কন্যার আর কখনও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, আজ তাঁহাকে একক সংগ্রামক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কখনও পলায়ন করিব না।"

সকলেই প্রেমানন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সকলেই আপন আপন জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এদিকে বিপক্ষগণ গোলা চালাইয়া এক এক জন করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৬০ জনকে ধরাশায়ী করিল। ত্রিশ জন মাত্র লোক যখন জীবিত আছে, তখন প্রেমানন্দ তাহাদিগকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পলায়ন করিতে অস্বীকার করিল।

তখন প্রেমানন্দ মনে করিলেন যে, অনর্থক আমার নিমিত্ত ইহারা কেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। বিশেষতঃ বিপক্ষগণ যখন ছদ্মবেশে আসিয়াছে, তখন পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলে কোনও দোষ নাই। বিপক্ষদল আততায়ীর ন্যায় কার্য্য করিতেছে। অগত্যা শেষে তিনি সেই বাকী ত্রিশ জন লোক লইয়া পলায়ন করিলেন। পাটগ্রামের এই যুদ্ধ পাটগ্রাম-কলঙ্ক বলিয়া বঙ্গ ইতিহাসে অভিহিত হইল।

পাটগ্রামের যুদ্ধে যে কয়েকজন লোক নিহত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন প্রেমানন্দের পক্ষের আর একজন লোককেও সিপাহী এবং জমাদারগণ ধৃত করিতে পারিল না। কিন্তু বিদ্রোহী প্রজাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার হুকুম ছিল। সুতরাং কোম্পানির জমাদার, বরকন্দাজ এবং সিপাহী দলে দলে চতুর্দ্দিকে ছুটিল। সমুদয় গ্রাম শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। লোক একেবারেই পাওয়া যায় না। তিনজন কুলি পাটগ্রামের রাস্তা দিয়া দিবাবসানে বাড়ী যাইতেছিল। সেখ মহম্মদ মোল্লা জমাদার তাহাদিগকে ধৃত করিয়া সঙ্গে করিয়া লইল। *

Vide note (20) in the appendix.

দ্বিতীয় জমাদার মৃর্জা মহম্মদ তহর অন্য একদিকে গিয়াছিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও একজন লোক দেখিতে পাইল না। কিন্তু রাস্তার পার্শ্বে এক বৃদ্ধা চাঁড়াল্নীর ২২ বৎসর-বয়স্ক পুত্র বিগত দুই বৎসর পর্য্যন্ত জ্বর এবং প্লীহারোগে শয্যাগত ছিল। মৃর্জা মহম্মদ তহর আর লোক না পাইয়া সেই চাঁড়াল্নীর পুত্রকে লইয়া চলিল। কিন্তু প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া তাহার পেটের ভার প্রায় অর্দ্ধমণ হইয়াছে। সে হাঁটিয়া যাইতে পারে না।

চাঁড়াল্নী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাপুরা আমার! বাছাকে যদি তোমাদের নিতে হয়, তবে কোলে করিয়া লইয়া যাও, বাছার আমার ব্যামোর শরীর। সকালে কিছু দই চিঁড়ে খেতে দিও।"

তহর মহম্মদ অগত্যা আর কি করিবেন। জীয়ন্ত মানুষ ধৃত করিবার হুকুম ছিল। মরা মানুষ ধরিয়া নিলে কোনও ফল নাই। সুতরাং অগত্যা সেই চাঁড়াল্নীর পুত্রকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুইজন বর-কন্দাজকে হুকুম করিলেন। তাহারা এই প্লীহারোগগ্রস্ত লোকটাকে স্কন্ধে করিয়া চলিল।

এইরূপে তিলকচাঁদ প্রভৃতি অন্যান্য জমাদারের মধ্যে, যে দিকে যে গিয়াছিল, তাহারা কেহ একজন অন্ধকে, কেহ একজন খঞ্জকে ধরিয়া আনিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত চলিল।

সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। তার পর আবার এই জমাদার এবং সাজওয়ালগণ ন্যূন বাইশ জন জীয়ন্ত লোক ধৃত করিয়াছে। ইহাতে জমাদারদিগের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। সকলেই মনে মনে স্থির করিল যে, গুড্ল্যাড্ সাহেবের নিকট বক্সিস্ চাহিতে হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পেটারসন্ সাহেব।

কুকার্য্য, অসদাচরণ এবং অত্যাচার করিয়া কেহই তাহা গোপন করিতে পারে না। ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে কালে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতি গোপনে লোক নরহত্যা করে; কিন্তু তাহা কখনও ছাপা থাকে না।

দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, গুড্‌ল্যাড্ এবং হেষ্টিংস রঙ্গপুর দিনাজপুরের অত্যাচার গোপন করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কালে সকলই প্রকাশ পাইয়া পড়িল। কারাগারবাসিনী অনাথা রমণীদিগের ক্রন্দন সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিল। শান্ত, সুশীলা, লজ্জাবতী বঙ্গমহিলারা অতি ক্ষীণস্বরে কারাগারে বসিয়া যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, সেই দুর্ব্বল ক্রন্দনধ্বনি, সেই আর্ত্তনাদ, কালে মহাত্মা এড্‌মাণ্ড্ বার্কের সুগভীর কণ্ঠধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়া জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; করুণরস-পরিপূর্ণ জীবন্ত ভাষায় ইতিহাসে সে ক্রন্দনধ্বনি উল্লিখিত হইয়া ভাবী বংশাবলীর কর্ণে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে লাগিল।

দেবীসিংহের নিষ্ঠুরাচরণ, দেবীসিংহের অত্যাচার নিবন্ধন প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে পর, কলিকাতা কৌন্সিল এই বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানার্থ পেটারসন্ সাহেবকে রঙ্গপুর প্রেরণ করিলেন। পেটারসন্ সাহেবকে নিযুক্ত করিবার কালে গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংস মনে করিয়াছিলেন যে, পেটারসন্ পূর্ব্ব ঘটনা সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবেন না। বিদ্রোহী হইয়া প্রজাগণ যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই কেবল রিপোর্ট করিবেন। কিন্তু এবার হেষ্টিংসের লোকনির্ব্বাচন সম্বন্ধে বড় ভ্রম হইল। পেটারসন্‌কে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার আশানুরূপ ফললাভ হইল না।

আমরা পাঠকগণের জ্ঞাত করণার্থে সংক্ষেপে এই স্থানে পেটারসন্ সাহেবের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

পেটারসন্ সাহেবের পিতা অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। পুত্রের ভারত-গমনের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজগণ ভারত-গমন-কালে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই তাঁহাদের বাইবেল (ধর্ম্মপুস্তক) সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন; এবং বম্বে উপকূলে পদার্পণ করিবার সময় তরবারি হস্তে করিয়া জাহাজ হইতে নামেন।

এই সকল ইংরাজগণের অসৎ দৃষ্টান্ত হইতে স্বীয় পুত্রকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, বৃদ্ধ পেটারসন্, পুত্রের কোটের বুকের নিকটস্থ পকেটে একখানা বাইবেল রাখিয়া, পকেটের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া অন্যান্য ইংরাজদিগের ন্যায় তাঁহার পুত্রও হয় তো বাইবেল পাঠ করিবেন না। কিন্তু একখানা বাইবেল অন্ততঃ বুকের কাছে থাকিলে হৃদয়স্থিত বিবেক একটু চাপা থাকিলে, একবারে গলিয়া যাইবে না।

বৃদ্ধ পেটারসনের এই আশা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার পুত্র যুবক পেটারসনের বুকের নিকট বাইবেল ছিল বলিয়াই তাঁহার বিবেক একবারে বরফের ন্যায় গলিয়া যায় নাই। বাইবেলের চাপা পড়িয়া বিবেক জমাট হইয়া রহিল।

কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস মনে করিলেন যে, গুড্ল্যাড্ সাহেব এবং লার্কিন সাহেবের ন্যায় পেটারসনের বিবেকও গলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রঙ্গপুরের বর্ত্তমান গোলযোগ তদন্ত করিবার নিমিত্ত পেটারসন্‌কে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন।

পেটারসন্ রঙ্গপুরে পৌঁছিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহী বলিয়া সেখ মহম্মদ মোল্লা, মৃজা মহম্মদ তহর এবং তিলকচাঁদ প্রভৃতি যে সকল লোককে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে গুড্ল্যাড্ সাহেব পেটারসন্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি ইহাদিগের জবানবন্দি লইতে আরম্ভ করিলেন।

সেক মহম্মদ মোল্লা যে প্লীহারোগগ্রস্ত চাঁড়াল্‌নীর পুত্রকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই উপর সর্ব্বাগ্রে পেটারসনের দৃষ্টি পড়িল। তাহার উদর অত্যন্ত স্ফীত ছিল। সুতরাং সে সহজেই লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিত। পেটারসন্ এই ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল—

"মুই আপন নাম না জানে। মুই ছোট মানুষ।"

তখন মহম্মদ মোল্লা অগ্রসর হইয়া বলিলেন "হুজুর, ইহার নাম ভেরকেশা। পেটারসন্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ভেরকেশা! টুমি যুদ্ধ করে?"

ভেরকেশা। হুজুর, মুই এখানে না আইতাম। বরকন্দাজ তখন কইলো—দোবেলা দই চিড়া মিল্‌বে। মুই কইলো—দোবেলা দই চিড়া,মেলে তো যায়, না মেলে না যায়।

পেটারসন্ সাহেব ইহার অবস্থা দেখিয়াই অবাক্। পেটের প্লীহার ভারে লোকটা চলিতে পারে না। এ ব্যক্তি যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহা গুড্ল্যাড্ সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত কলেক্টর ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না।

ইহার পর মৃজা মহম্মদ তহরের আনীত আসামীগণকে পেটারসন্ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাদের একজনের নাম চুয়াপানি, দ্বিতীয়ের নাম ঝাবুরু, তৃতীয়ের নাম খের্‌কেটু।

এই তিন ব্যক্তি পেটারসনের নিকট আসিবামাত্রই চীৎকার করিয়া বলিল—

"হুজুর, মুই তিন লোকের মাথায় মোট দিয়া জমাদার আন্‌লে। হাঙ্গামা না করে।"

পেটারসন্ ইহাদিগের কথা শুনিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

অবশেষে তিলকচাঁদ জমাদার এক জন অন্ধ এবং এক জন খঞ্জকে উপস্থিত করিয়া বলিল "হুজুর, পাটগ্রাম যুদ্ধের সময় এই লোকটার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। এ বড় দুষ্ট লোক। পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। তখন আমি নিজে ইহার পাছে পাছে দৌড়িয়া ইহাকে ধৃত করিলাম। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নুরাল দাইনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ প্রধান বিদ্রোহীর জামাতা।"

তিলকচাঁদ এই কথা বলিবামাত্র অন্ধ লোকটা বলিয়া উঠিল,

"ধর্ম্মাবতার! পাটগ্রাম যুদ্ধে না যায়। মোর সাত পুরুষেরও চক্ষু না থাকে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "মুই নুরাল মহম্মদের জামাই না হয়। মোর সাত পুর্ষেও বিয়া না করে।"

আসামীদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পেটারসন্ সাহেব ইহাদিগকেও ছাড়িয়া দিলেন, এবং উপযুক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জমিদারদিগকে তলপ করিলেন। জমিদারগণ প্রায় সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পেটারসন্ সাহেব তাঁহাদিগকে হাজির হইবার নিমিত্ত ইস্তাহার দিলেন। কিন্তু অন্য কোনও জমিদার হাজির হইলেন না। কেবল শিবচন্দ্র চৌধুরী হাজির হইয়াছিলেন। তিনি পেটারসন্ সাহেবের নিকট বিদ্রোহের প্রকৃত অবস্থা বলিলেন। পেটারসনের সঙ্গে কোনও আমলা ছিল না। সুতরাং শিবচন্দ্রের জবানবন্দি তখন লিখিত হইল না। পেটারসন্ শিবচন্দ্রের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। গুড্‌ল্যাড্ সাহেব তাঁহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করিয়া, তাঁহাকে দেবীসিংহের জেম্মা করিয়া দিলেন। দেবীসিংহ শিবচন্দ্র চৌধুরীর হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কয়েদ রাখিলেন। শিবচন্দ্রের এই দুরবস্থা দেখিয়া আর একটী লোকও জবানবন্দি দিতে হাজির হইল না।

শিবচন্দ্র পেটারসনের নিকট বলিয়াছিলেন যে, দেবীসিংহ অধিক জমা

তলপ করিয়া প্রজা এবং জমিদারদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতেই প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল।

পেটারসন্ সাহেব তখন দেবীসিংহের নিকট ১১৮৮ এবং ১১৮৯ সনের জমা ওয়াশীল তলপ করিলেন। দেবীসিংহ অগত্যা বাধ্য হইয়া জমা ওয়াশীল দাখিল করিলেন। কিন্তু গুড্‌ল্যাড্ সাহেব এই সকল জমা ওয়াশীলের নকল রাখিবার ছলনা করিয়া, পেটারসন্ সাহেবের নিকট হইতে তাহা ফেরত লইয়া দেবীসিংহকে দিলেন। দেবীসিংহ সে জমা ওয়াশীল আর পেটারসনের নিকট দাখিল করিলেন না। কলিকাতা আসিয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট তাহা দাখিল করিলেন। *

এই সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পেটারসন্ সাহেবের তদন্তে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। দেবীসিংহ এবং গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের দৌরাত্ম্যে বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া পেটারসন্ রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস এবং গঙ্গাগোবিন্দ ইহাতে পেটারসনের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; পেটারসন্‌কে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন; এবং এই বিষয় তদন্তের নিমিত্ত নূতন কমিশন নিযুক্ত করিলেন।

নূতন কমিশন নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুর আসিলেন। নূতন কমিশনের নিকট পেটারসন্‌কে আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু এ কমিশনের তদন্ত পাঁচ ছয় বৎসরেও শেষ হইল না। ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ সাল পর্য্যন্ত কমিশনের তদন্ত চলিতে লাগিল।

সদ্বিচারের আশা দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার প্রধান উপায়ই কমিশন নিয়োগ। কমিশন মকরর হইলেই লোকের আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু ইহার শেষ ফল "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" এ কমিশনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অনেক বিলম্ব আছে। অতএব ১৭৮৪ সালের পর গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আর যে সকল কার্য্য করিলেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাই অগ্রে উল্লিখিত হইবে। পাঠকগণ পাঁচ বৎসর পরে কমিশনের তদন্তের ফল জানিতে পারিবেন।

---

* Vide note (18) in the appendix.

ত্রিংশ অধ্যায়

শেষ কুক্রিয়া।

রঙ্গপুর বিদ্রোহের দুই বৎসর পরে ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ সজলনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে হেষ্টিংসের নিকট কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করিলেন। বঙ্গদেশের সমুদয় ভূমিই হেষ্টিংসের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দের ন্যায় বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ভূমি দান করা তিনি নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, এবং দিনাজপুরের রাজার জমিদারীর অন্তর্গত সালবারি পরগণা গঙ্গাগোবিন্দকে দান করিলেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বে দিনাজপুরের রাজার জমিদারীর কতক অংশ দেবীসিংহ চক্রান্ত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দকে কবলা করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারীর যে অংশ সম্বন্ধে সেই ফেরবি কবলা লিখিত হইয়াছিল, সেই অংশই এখন ওয়ারেন হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে দান করিলেন। দেবীসিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পূর্ব্বের ফেরব এবং চক্রান্ত এখন ওয়ারেন হেষ্টিংস অনুমোদন পূর্ব্বক গঙ্গাগোবিন্দকে সালবারি পরগণার মালিকী স্বত্ব প্রদান করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের প্রসাদে দিনাজপুরের রাজার জমিদারীর এক অংশের মালিক হইলেন।

কিন্তু হেষ্টিংসের বঙ্গদেশ পরিত্যাগের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দিনাজপুরের রাজার পক্ষ হইতে সালবারি পরগণার নিমিত্ত গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে নালিস উপস্থিত হইল। কর্ণওয়ালিস হেষ্টিংসের ভূমিদান নামঞ্জুর করিয়া সালবারি পরগণা দিনাজপুরের রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় রঙ্গপুর দিনাজপুরের বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন।

বস্তুতঃ দিনাজপুরের বিদ্রোহই যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একমাত্র মূল কারণ, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসিগণ নুরাল মহম্মদ এবং দয়ারামের শোণিতের মূল্যের পরিবর্ত্তে যে এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। ইস্তমুরারি বন্দোবস্ত দ্বারা বঙ্গদেশের অশেষ উপকার হইয়াছে। 'ইস্তমুরারি বন্দোবস্তই ইংরাজ রাজত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। কিন্তু নুরাল মহম্মদ এবং দয়ারাম প্রাণ বিসর্জ্জন না করিলে, কখনও বঙ্গদেশে ইস্তমুরারি বন্দোবস্ত হইত না।

* * * * *

প্রেমানন্দ গোস্বামী পাটগ্রাম-কলঙ্কের পর মালদহে যাইয়া স্ত্রী এবং কমলাদেবীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে লক্ষ্মণ সিংহ কমলাদেবীর পুত্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন।

লক্ষ্মণ মনে করিয়াছিলেন যে, কমলাদেবী এখন দিনাজপুরে রাম সিংহের বাড়ীতেই আছেন। সুতরাং ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে করিয়া তিনি প্রথমতঃ দিনাজপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে কমলাদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। তখন তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা রাম সিংহ সপরিবারে ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে করিয়া মালদহে যাত্রা করিলেন। দুই দিনের মধ্যেই তাঁহারা মালদহে আসিয়া পৌঁছিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

পুত্রমুখদর্শন।

প্রেমানন্দ, সত্যবতী এবং কমলাদেবী এখন রামানন্দ গোস্বামীর পৈতৃক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। কমলাদেবী লক্ষ্মণের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন ইঁহারা সর্ব্বদাই প্রায় লক্ষ্মণের বিষয়ে কথা বার্ত্তা বলেন। কখন লক্ষ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, লক্ষ্মণের ন্যায় সৎপুরুষ এ সংসারে আর

নাই, সর্ব্বদাই ইঁহাদের মধ্যে এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়া থাকে।

এক দিন প্রেমানন্দ কমলাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা! লক্ষ্মণ আপন নাম সার্থক করিয়াছেন। যখন দশরথপুত্র লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনে যাইতেছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসী সমুদয় নরনারী লক্ষ্মণের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

'একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে'॥"

কমলাদেবী বলিলেন "বাছা! এ জীবনে আমি লক্ষ্মণের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি দিন দিন লক্ষ্মণের মঙ্গল কামনা করিয়া শিবপূজা করি। আমি সর্ব্বদা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি লক্ষ্মণকে সুখী করুন।"

প্রেমানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মা! লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই বলেন যে, আপনি সুখী হইলেই তিনি সুখ বোধ করেন। তবে লক্ষ্মণকে সুখী কর—এ প্রার্থনা না করিয়া, আমাকে সুখী কর—ইহা বলিলেও, সেই এক কথাই হয়।"

কমলাদেবী বলিলেন "বাছা! কি আশ্চর্য্য! আমার দ্বারা লক্ষ্মণের তো কখনও কোনও উপকার হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ আমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন না।"

প্রেমানন্দ। মা, তুমি আপনাকে চিনিতে পার না। পরমা সাধ্বী রমণীরা স্বীয় স্বীয় জীবনের পবিত্রতার দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের যে উপকার করেন, অর্থ, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য—কিছুর দ্বারাই জগতের সেইরূপ উপকার হয় না। সাধ্বীগণের মৃত্যুর পরও তাঁহাদিগের দ্বারা জগৎ উপকৃত হয়। জনকতনয়া বৈদেহী যুগযুগান্তর হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজও তাঁহার সদ্দৃষ্টান্ত রমণীদিগকে সৎপথে পরিচালন করিতেছে।

ইঁহারা দুই জনে পরস্পরের সঙ্গে এই রূপে কথা বার্ত্তা বলিতেছেন। সত্যবতী নিকটে বসিয়া ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। এমন সময় জগা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল যে, দিনাজপুরের সেই জেলের জমাদার রামসিংহ দুই জন স্ত্রীলোক এবং অপর দুই জন পুরুষকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন।

রামসিংহের কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ তৎক্ষণাৎ বাহিরবাড়ী চলিলেন।

কমলাদেবীও তাঁহার পাছে পাছে চলিলেন। অর্দ্ধপথ যাইবামাত্র প্রেমানন্দ দেখেন রামসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ, রামসিংহের স্ত্রী এবং লক্ষ্মণের স্ত্রী আর এক-জন যুবক তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছেন। যুবককে দেখিয়া প্রেমানন্দ বুঝি-লেন যে, ইনিই কমলাদেবীর পুত্র হইবেন। কিন্তু কমলাদেবী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ হইতে সে যুবকের মুখাকৃতি দেখিয়াই বৎসহারা গাভীর ন্যায় দৌড়িয়া যাইয়া, দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক, লক্ষ্মণ এবং সেই যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

কমলাদেবীর এক বাহু লক্ষ্মণের গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়াছে, অপর বাহু স্বীয় পুত্রের গলদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। দুই বাহু দ্বারা দুই জনের মস্তক পাগলিনীর ন্যায় স্বীয় বুকের দিকে টানিতেছেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রনাথ তখন "আমি তোমার চির অপরাধী, অকৃতজ্ঞ সন্তান" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া জননীর পদতলে পড়িয়া গেলেন।

এই সময় ইঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বাক্যে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। সহৃদয় পাঠক, সহৃদয়া পাঠিকা কল্পনাতে আপনাকে তদবস্থাপন্ন মনে করিলেই, ইঁহাদের হৃদয়স্থিত ভাব বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষেত্রনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে পর, প্রেমানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাই-লেন। তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বারংবার আপনাকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "মা! আমি তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান, তুমি সত্য সত্যই কুপুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। আমি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে ছিলাম। আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হইত।"

কিন্তু কমলাদেবীর মুখে আর কথা নাই। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও তিনি স্পষ্টরূপে কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি কি বলিতেছেন, কেহ বুঝিতেও পারিল না। কেবল "আমার বাছা" "আমার বাছা" এই শব্দই শুনা গেল।

তিনি প্রাণপণে লক্ষ্মণের এবং পুত্রের মস্তক বুকের দিকে টানিতে লাগি-লেন। দীর্ঘাকার বীর পুরুষ লক্ষ্মণ পোষিত সিংহের ন্যায়, কমলাদেবী যে দিকে তাঁহার গলা ধরিয়া টানিতেছেন, সেই দিকেই গলা সরাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ইঁহারা সকলে এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

সত্যবতীও ইঁহাদিগের বিলম্ব দেখিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। রামসিংহ সত্যবতীকে দেখিয়াই বিস্ময়পূর্ণনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে প্রেমানন্দ সকলকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সত্যবতী এবং কমলাদেবী রামসিংহের স্ত্রী এবং লক্ষ্মণের স্ত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ এবং সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা প্রায় মাসাধিক পর্য্যন্ত পরমসুখে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মাসাধিক পরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন যে, বঙ্গদেশে থাকিবার তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা নাই। লক্ষ্মণেরও এবার পঞ্জাব যাওয়ার পর হইতে, পঞ্জাবে বাস করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। রামসিংহের কোনও বিষয়ে মতামত প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে যে দিকে ইচ্ছা, পরিচালন করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রনাথের কথায় রামসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ—সকলেই পঞ্জাব যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু প্রেমানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কাহারও ইচ্ছা নাই। প্রেমানন্দকেও ইঁহারা সপরিবারে পঞ্জাবে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রামসিংহ এখানে আসার পর হইতে সর্ব্বদাই বিস্ময়াপন্ন নেত্রে সত্যবতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

প্রেমানন্দ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক দিন হাসিতে হাসিতে রামসিংহকে বলিলেন—

"আপনার সেই ভৃত্য নান্‌কুর কোনও অনুসন্ধান পাইয়াছেন?"

সত্যবতী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

রামসিংহ বলিলেন, "না—নান্‌কু যে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার কোনও খবর পাই নাই!"

প্রেমানন্দ হাস্য করিয়া সত্যবতীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "নান্‌কুর ভগ্নীর ন্যায় দেখায় না?"

রামসিংহ বলিলেন "হাঁ। ঠিক নান্‌কুর মুখের ন্যায় ইঁহার মুখখানি।"

প্রেমানন্দ। নান্‌কুকে আপনি পোষ্যপুত্র রাখিবেন বলিয়া কি স্থির করিয়াছিলেন? ইনি যদি নান্‌কু হয়েন, তবে ইঁহাকে পালিত কন্যা করিবেন?

রামসিংহ কোনও উত্তর দিলেন না। পরে প্রেমানন্দ সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রামসিংহ তখন সত্যবতীকে বলিলেন

"মা! আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে। কিন্তু আমি তোমাকে নান্‌কু বলিয়াই ডাকিব।"

রামসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ এবং ক্ষেত্রনাথের অনুরোধে প্রেমানন্দও বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্জাবে যাইয়া বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগকে বলিলেন যে, রঙ্গপুরের এই কমিশনের ফল না দেখিয়া, তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি বঙ্গদেশের অত্যাচার নিবারণার্থ বিগত পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গের ভাবী অবস্থা কি হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রঙ্গপুরের বিদ্রোহীদিগের মধ্যে যে দুই একজন লোক ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি কোনও দণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

রামসিংহ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন "কেন তুমি রঙ্গপুরের লোকের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে চাহ? বাঙ্গালী জাত কুকুর। তুমি যে সকল জমিদারের উপকারের নিমিত্ত প্রাণ দিতে গিয়াছিলে, এখন দেখ, কমিশনের নিকট তাহারা কিরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। তোমাকে পর্য্যন্ত জড়াইয়া দিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছে।"

প্রেমানন্দ এই কথা শুনিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন—

"আপনি অনর্থক এই বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা করিতেছেন। আমি স্বীকার করি, বাঙ্গালী জাত সত্য সত্যই কুকুর। কুকুর না হইলে ইহাদের এরূপ দুরবস্থা হইবে কেন। কিন্তু কে ইহাদিগকে কুকুর করিয়াছে? কে ইহাদিগের হৃদয় মন মনুষ্যাত্মা-শূন্য করিয়া ইহাদিগকে জঘন্য পশুজীবন প্রদান করিয়াছে? ইহারা তো আর মাতৃগর্ভ হইতে কুকুররূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই?"

রামসিংহ। কে ইহাদিগকে কুকুর করিয়াছে?

প্রেমানন্দ। দেশপ্রচলিত শাসনপ্রণালীই প্রজাদিগের চরিত্র গঠন করে। দেশপ্রচলিত রাজনৈতিক অত্যাচারেই প্রজা-সাধারণকে কুকুর করিয়া তুলে। আপনি দেখিতেছেন না যে, দেবীসিংহ, রমানাথ দাস, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় অতি জঘন্যচরিত্রের লোককেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিতেছেন। যাহারা মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-তোষামোদবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারাই শাসনকর্ত্তাদিগের প্রিয়পাত্র হয়। সুতরাং জনসাধারণ মিথ্যাপ্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার বিশেষ-লাভ-প্রদ মনে

করিয়া সেই পথই অবলম্বন করে। কিন্তু আপনি কুকুর বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করিতেছেন, ইহাদিগের মধ্যে মনুষ্যাত্মা প্রদান করা যাইতে পারে। যদি পাটগ্রামের অবস্থা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন, তবে কখনও ইহাদিগকে কুকুর বলিতেন না। সমুদয় লোককে আমি পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে বলিলাম, কিন্তু একটি লোকও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল না। আমার চতুষ্পার্শ্বে তাহারা প্রাচীরস্বরূপ হইয়া আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। সকলের মুখেই এইরূপ কথা—

"আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রেমানন্দের জীবন রক্ষা করিব। প্রেমানন্দ ভিন্ন আর কে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া আমাদের স্ত্রী কন্যার ধর্ম্মরক্ষা করিবে?"

প্রেমানন্দের কথা শুনিয়া রামসিংহ আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু পাটগ্রামের অবস্থা স্মরণ হইবামাত্র প্রেমানন্দের দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

উপসংহার।

১৭৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রঙ্গপুরের কমিশনের তদন্ত শেষ হইল। অনেকানেক বঙ্গকুলাঙ্গার দেবীসিংহের ভয়ে, এবং অনেকানেক কাপুরুষ জমিদার দেবীসিংহের অনুগ্রহ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল। তাহারা বলিল যে, দেবীসিংহ এই সকল অত্যাচারের বিষয় কিছু জানিতেন না। হররামই কেবল অত্যাচার করিয়াছে।

এই সকল বঙ্গকুলাঙ্গার পেটারসন্ সাহেবের তদন্তকালে, দেবীসিংহ নিজে যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাও প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং পেটারসন্ সাহেব এখন একপ্রকার মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িলেন।

কমিশনরগণ অবধারণ করিলেন যে, দেবীসিংহ এবং গুড্ল্যাড্ সাহেবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আইনসঙ্গত প্রমাণ নাই। কিন্তু বিলাতি প্রণালী

অনুসারে বিচার না করিলে, দেবীসিংহ এবং গুড্‌ল্যাডের বিরুদ্ধেও অপরাধ সাব্যস্ত হইত।

দেবীসিংহ খালাস পাইলেন। দেবীসিংহের পক্ষের অনেকানেক লোক বিদ্রোহের সময়ই নিহত হইয়াছিল। কেবল হররাম প্রভৃতি কয়েকজন লোক জীবিত ছিল। হররামের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল *। আর প্রজাদিগের মধ্যে পাঁচজন বিদ্রোহী দলের লোক বলিয়া সাব্যস্ত হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইহাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকার্য্যের মধ্যে এই একটি গুরুতর কলঙ্ক। ইহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহাদের স্ত্রী কন্যার প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহাতে ইহাদিগকে দণ্ড প্রদান করা কোনপ্রকারেই ন্যায়-সঙ্গত ছিল না।

প্রেমানন্দ রঙ্গপুর যাইয়া এই প্রজা পাঁচজনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন— "তোমাদের কোনও ভয় নাই। বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলে পর তোমরা পঞ্জাবে চলিয়া যাইবে। আমি তোমাদের স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া পঞ্জাবে যাইয়া তোমাদের সঙ্গে একত্রে সেখানে থাকিব।"

প্রেমানন্দের এই কথা শুনিয়া তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিল। এবং কয়েকদিন পরে তাহারা বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

কমিশনের তদন্তকালে প্রেমানন্দ দুই তিনবার লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শুদ্ধ কেবল রঙ্গপুরের বিদ্রোহের নিমিত্তই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হইয়াছেন। রঙ্গপুরের বিদ্রোহ নিবন্ধন দেশের আরও একটী উপকার হইল। ব্রহ্মত্র, দেবত্র প্রভৃতি নিষ্কর জমির স্বত্ব অনুসন্ধানার্থ নিয়মিতরূপে বাজে-জামিন সেরেস্তা সংস্থাপিত হইল। রঙ্গপুরের বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাজে-জামিন সেরেস্তা সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়াই বিশেষ আগ্রহের সহিত লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাজে-জামিন সেরেস্তা নিয়মিতরূপে সংস্থাপন করিলেন।

প্রেমানন্দ যে জন্মের মত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া, কমলাদেবীর পুত্র ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে পঞ্জাবে চলিয়া যাইবেন, এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

* Vide note (21) in the appendix.

প্রেমানন্দের অনেকানেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া তাঁহাকে পঞ্জাব যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খুড়্তাত ভ্রাতা সচ্চিদানন্দ গোস্বামী নিজের ব্রহ্মত্র জমির মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত এই সময় কলিকাতায় ছিলেন। তিনি প্রেমানন্দের সঙ্গে এক টোলে একত্রে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন। প্রেমানন্দকে পঞ্জাব যাইতে নিষেধ করিয়া তিনি কলিকাতা হইতে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। প্রেমানন্দ পঞ্জাবে যাত্রা করিবার দুই দিন পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দের পত্রের প্রত্যুত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"পরমকল্যাণবর শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ গোস্বামী

পরমকল্যাণবরেষু।

"আমার শুভাশীর্ব্বাদ সহ তোমার পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমাকে জানাইতেছি যে, আমি সত্য সত্যই বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি যে, বঙ্গদেশের অত্যাচার এবং অরাজকতা শীঘ্র শীঘ্র নিবারণ হইবে না। বরং কাল সহকারে এ অত্যাচারানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইবে। তোমার যদি একটু চিন্তাশক্তি থাকিত, তবে বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতে। বল দেখি এ অত্যাচার কিরূপে নিবারণ হইতে পারে? এক দিকে কতকগুলি অর্থলোভী বণিক্ কেবল অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই এ দেশে বাস করিতেছে। অপর দিকে নিতান্ত নিস্তেজ পারস্পরিক সহানুভূতি-শূন্য কাপুরুষ বাঙ্গালী জাতি। এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের পারস্পরিক সম্মিলন দ্বারা যেরূপ অবস্থা হইতে পারে, তাহাই হইতেছে। জল এবং চিনি মিশ্রিত হইলে সুমিষ্ট সরবৎ প্রস্তুত হয়। কিন্তু জলের সঙ্গে কর্দ্দম মিশ্রিত করিলে সরবৎ হয় না। সেইপ্রকার এই বলবান্ কর্ম্মঠ ইংরাজ বণিক্‌দিগের সহিত অন্য কোনও সতেজ এবং বলবান্ জাতির সম্মিলন হইলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইত; পরস্পরের গুণ পরস্পরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু নিস্তেজ এবং নীচাশয় বাঙ্গালী জাতির প্রতি স্বভাবতই ইংরাজদিগের ঘৃণার উদয় হইতে পারে।

"বাঙ্গালী জাতি নীচাশয় ও নিস্তেজ বলিয়াই ইংরাজগণ অধিক অর্থ সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, রামনাথ দাস প্রভৃতির

ন্যায় নরপিশাচদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করিতেছেন। এই সকল নীচাশয় বাঙ্গালী ইংরাজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপন দেশীয় লোকের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেশের মধ্যে ভাল লোক জন্মিতেও পারে না। মানুষ উচ্চ পদ চাহে। কিন্তু অন্য দেশে সচ্চরিত্র লোক উচ্চ পদ লাভ করে। আমাদের দেশে দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ন্যায় লোকেরাই উচ্চ পদ পায়। সুতরাং দেশ শুদ্ধ সকল লোক এবং ভাবী বংশাবলী পর্য্যন্ত দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দসিংহের অসদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

"বঙ্গদেশের দুরবস্থার বিষয় আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। ১৭৬১ সালে যখন মালদহে গ্রে সাহেব এবং রামনাথ দাস প্রথম অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে আজ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছি। পূর্ব্বে মনে করিতাম যে, এক দিন না এক দিন, এ অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিব। এখন অনেক পরিমাণে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু মনে করিবে না যে, নিরাশ হইয়াছি বলিয়া চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকিব।

"ভাই, বাঙ্গালীর এক রোগ নহে। বিভিন্ন প্রকারের শত শত রোগ জড়িত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। কেবল জ্বর হইলে, অনায়াসে একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই সে জ্বর আরাম হয়। কিন্তু জ্বর, কাসি, আমাশয়, প্লীহা, যকৃৎ, এই পাঁচটি রোগ জড়িত হইয়া কোনও লোকের শরীরে প্রবেশ করিলে, তখন ঔষধের ব্যবস্থাই চলে না। এক রোগের ঔষধে অন্য রোগ বৃদ্ধি করে।

"বাঙ্গালী জাতি যদি কাপুরুষতা নিবন্ধন কেবল রাজনৈতিক অত্যাচারে নিপীড়িত হইত, তবে সমবেত চেষ্টা দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য যত্ন করিতাম। কিন্তু ইহাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাও যার-পর-নাই ঘৃণিত। জাতিভেদ, স্ত্রীজাতির অবরুদ্ধাবস্থা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সহমরণ প্রভৃতি কুৎসিত দেশাচার ইঁহাদিগকে ক্রমেই অবনতাবস্থা হইতে সমধিক অবনতাবস্থায় পরিচালন করিতেছে।

"তুমি হয় তো মনে করিবে, আমি গত বৎসর তোমার সহিত একত্রে কলিকাতা অবস্থান কালে, পাদ্রি সাহেবদিগের সঙ্গে সময় সময় আলাপ করিতাম, তাহাতেই আমার খৃষ্টানি মত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। পাদ্রিদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার অনেক পূর্ব্বে, যখন লক্ষ্মণসিংহের সঙ্গে

কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, তখনই আমার জ্ঞানচক্ষু অনেক বিষয়ে উন্মীলিত হইয়াছে। সামাজিক অনেকানেক কুৎসিত আচরণের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

"লক্ষ্মণের সঙ্গে কমলাদেবীর পুত্রের অনুসন্ধানে জঙ্গলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিয়াছি। নির্জ্জনে এক একটা জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া, এক একটা পাহাড়ের উপর বসিয়া অবিশ্রান্ত চিন্তা করিয়াছি। একাদিক্রমে এগার বৎসর চিন্তা করিয়াছি। তখন আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই এই প্রশ্নের উদয় হইত—কেন বাঙ্গালী জাতির কোনও জাতীয় জীবন নাই? কেন বাঙ্গালী জাতি নিস্তেজ? কেন বাঙ্গালী জাতি এইরূপ স্বার্থপর? কেন বাঙ্গালী এত নীচাশয়?

"এই সকল প্রশ্ন বারংবার চিন্তা করিয়া নিজেই মীমাংসা করিয়াছি। এদেশের যদি একখানা প্রকৃত ইতিহাস থাকিত, তবে তুমিও একটু চিন্তা করিলেই, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইতে।

"ভাই, আমাদের ভারতবর্ষের যে সকল লোকের বীরত্ব ছিল, শূরত্ব ছিল, তেজ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সন্তান। পলায়িতদিগের বংশাবলী বলিয়াই আমরা এত কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এই কাপুরুষতা কাল সহকারে ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

"সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির পর এই ত্রিশ বৎসর যে ঘোর অত্যাচার চলিতেছে, যে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর কাপুরুষতা শত গুণে বৃদ্ধি হইবারই কথা। দেশের যে সকল জঘন্যপ্রকৃতির লোক আজীবন আমাদের পিতৃপিতামহের গোলাম ছিল, তাহারাই ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুঠির প্যাদা কিংবা গোমস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া এখন দেশের প্রধান লোক হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গসমাজের নেতা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষাও শত গুণে কাপুরুষ ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংগ্রামক্ষেত্রে একবার গিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংগ্রামক্ষেত্র কখনও দর্শনও করে নাই। সুতরাং বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান নেতৃগণের সমধিক কাপুরুষ হইবারই কথা।

"তোমার সঙ্গে যখন একত্রে টোলে অধ্যয়ন করিতাম, তখন কতবার তোমাকে বলিয়াছি যে, আমাদের শাস্ত্রের ন্যায় আর শাস্ত্র নাই। কিন্তু দেশভ্রমণ করিয়া আমার সে কুসংস্কার দূর হইয়াছে। যদি আমাদের শাস্ত্রে প্রকৃত সার পদার্থ অধিক থাকিত, তবে বাঙ্গালীর এমন দুর্দ্দশা কেন হইবে?

"তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমার পিতাঠাকুর আমাকে ম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষা করিতে দিলেন না বলিয়াই আমি বাল্যকালে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, দেশ-ভ্রমণকালে যখন দুই বৎসর অযোধ্যায় ছিলাম, তখন একজন মুসলমানের নিকট আমি পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া আমরা ঘৃণা করিতাম। কিন্তু তাহারাও অনেক বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে। আমরা আর্য্য আর্য্য বলিয়া যতই আস্ফালন করি না কেন, আমাদের দেশের একখানা ইতিহাস নাই। বস্তুতঃ মুসলমানগণ আমা-দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করিলে, কখনও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না।

"যে জাতীয় লোকের ইতিহাস নাই, তাহাদের জাতীয় জীবন যে কখনও ছিল, তাহা বোধ হয় না।

"আমি আর একটি বিষয় তোমাকে বলিতেছি। তুমি হয় তো আমার পত্র পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি যে এত ভীরু, তাহার মূল কারণ নারীজাতির অবরুদ্ধাবস্থা। সন্তান নিশ্চয়ই মাতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং অবরুদ্ধাবস্থাপন্ন ভীরু রমণীকুলের গর্ভে কখনও বীরের জন্ম হইতে পারে না।

"তোমার পত্রে তুমি আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছ যে, আমি অনর্থক রঙ্গপুরের প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দিয়া, অত্যন্ত কুকার্য্য করিয়াছি। কিন্তু ভাই, তুমি বড় নির্ব্বোধ। তুমি যে ন্যায় এবং দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছ, সে সকল পণ্ডশ্রম মাত্র। কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা তুমি কিছুই বুঝিতে পার না।

"রঙ্গপুরের দয়ারাম এবং নুরাল মহম্মদ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন বলি-য়াই ইস্তমুরারি বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইয়াছে! এবং নিষ্কর দেবত্র ও ব্রহ্মত্র জমির স্বত্ব অনুসন্ধানার্থ বাজে জামিন সেরেস্তা সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি

লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই প্রস্তাব বিলাতে মঞ্জুর হয়, তবে দেশের ভূমাধিকারিগণ দয়ারাম এবং নুরাল মহম্মদের শোণিতের মূল্যস্বরূপ এই অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

"ভাই একটা কথা হঠাৎ স্মরণ হইল। খৃষ্টান পাদ্রিগণ বলিয়া থাকেন যে, খৃষ্টের রক্তের দ্বারা জগৎ উদ্ধার হইয়াছে। খৃষ্ট প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াই মানবমণ্ডলীর উদ্ধারের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাণবিসর্জ্জন না করিলে, কেহ জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। খৃষ্টান পাদ্রিদিগের এই কথাটি বড় সার কথা বলিয়া বোধ হয়।

"দয়ারাম, নুরাল মহম্মদ এবং অন্যান্য কয়েকজন লোক প্রাণবিসর্জ্জন না করিলে, কিংবা রঙ্গপুরের এই বিদ্রোহ না হইলে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এত পক্ষপাতী হইতেন না। ফ্রান্সিস্ ফিলিপ তো বিশ বৎসর পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না কেন? খৃষ্টান পাদ্রিদিগের সকল কথাই অসার বলিয়া মনে করিবে না।

"তোমাকে এই স্থানে আর একটি বিষয় সাবধান করিয়া দিতেছি। আজ কাল আমাদের দেশে কেবল কৃষ্ণচরিত্রেরই ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। ভাই, তুমি কৃষ্ণচরিত্র ছাড়িয়া বরং খৃষ্টচরিত্র পাঠ কর। কৃষ্ণচরিত্র অনেক মাজাঘসা করিলেও তাহার মধ্যে কি দেখিতে পাইবে? আর কি দেখিবে?—দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চারি পাঁচটা গোপিনী। অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে গরু তাড়াইবার এক পাঁচনী এবং একটা বাঁশী। কিন্তু খৃষ্টের চরিত্র মধ্যে অনেক মহৎ ব্যাপার দেখিতে পাইবে। নিঃশঙ্কহৃদয়ে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণবিসর্জ্জন, শত্রুর নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং মুখে কেবল এই ধ্বনি—"পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার ইচ্ছা নহে।" (Father, let Thy will be done and not mine).

"তুমি লিখিয়াছ যে, বাজে জামিন সেরেস্তা এবং বিবিধ বিচার-আদালত স্থাপিত হইয়া দেশের বড় মঙ্গল হইয়াছে; কিন্তু আমি তাহা মনে করি না। ইংরাজি বিচারপ্রণালী এই দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জাল, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কেহ মোহর জাল করিতে জানিত না। মুঙ্গেরের কলেক্টর বেটম্যান সাহেব এই দেশীয়লোকদিগকে প্রথমতঃ মোহর জাল করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল

ব্রহ্মত্ব জমির মালীকগণের কাহারও ঘরে কোনও দলিল নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ দলিল না দেখাইলে ব্রহ্মত্র ছাড়িয়া দিবে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া লোকে জাল দলিল প্রস্তুত করিতে শিখিবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোক কথায় কথায় সাক্ষীর তলপ করেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া লোকে মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করিবে। আমার পিতা যে রাণী ভবানীকে খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল "ধর্ম্ম সাক্ষী" এই কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতি প্রণালী অনুসারে তিন জন সাক্ষীর আবশ্যকতা হয়।

"তোমার পত্রের শেষ ভাগ পাঠ করিয়া আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। মনে হয় যে, তুমি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছ। তুমি লিখিয়াছ যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আমার খুড়্তাত ভাই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া, তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ। অতএব আমি এই সুযোগে চেষ্টা করিলে একটা রায় বাহাদুর কি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিতে পারি।

"ভাই, আমার বোধ হয় না যে, কোনও বুদ্ধিমান্ লোক কিংবা কোনও ভদ্রলোকের সন্তান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রদত্ত রাজা বাহাদুর কিংবা রায় বাহাদুর উপাধি পাইবার নিমিত্ত কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

"কাসিমবাজারের সাইক সাহেবের বেনিয়ানের পুত্র একজন সুবর্ণবণিক্, কিংবা গ্রে সাহেবের বেনিয়ানের পুত্র একটা সদেগাপ, অথবা বারওয়েল্ সাহেবের সরকারের পুত্র একটা তেলী—এই শ্রেণীস্থ লোকই রায় বাহাদুর কিংবা রাজা বাহাদুর উপাধির নিমিত্ত লালায়িত হইতে পারে। ইহাদের পিতা পিতামহ ইংরেজদিগের বাণিজ্যকুঠির কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভদ্রসমাজে এখনও কল্কে পাইতেছে না। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অনুরোধে কোনও সাধারণ হিতকর কার্য্যে দশ বিশ হাজার টাকা দিয়া, একটা ফাঁকা রায় বাহাদুর কিংবা রাজা বাহাদুর উপাধি পাইলে ইহারা ভদ্রসমাজভুক্ত হইতে পারিবে।

"তুমি কি বুঝিতে পার না যে, আমি এইরূপ কুকার্য্য করিলে আমার পিতামহ প্রপিতামহের নাম কলঙ্কিত করা হয়। পরমানন্দ গোস্বামীর প্রপৌত্র, অদ্বৈতানন্দ গোস্বামীর পৌত্র—রামানন্দ গোস্বামীর পুত্র—আমি প্রেমানন্দ গোস্বামী—আমাকে এদেশের মধ্যে কে না চিনে? তুমি কি জান না

যে, যখন ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে আমার স্ত্রী রাণী ভবানীর বাড়ী গিয়াছিলেন, তখন রাণী ভবানী তাঁহাকে সস্নেহে এবং সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণের প্রধান স্ত্রীর সঙ্গে একাসনে বসাইয়া মাতৃস্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক, তালবৃন্ত হাতে করিয়া আমার স্ত্রীকে বাতাস করিয়াছিলেন?

"তবে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াও যখন আমার স্ত্রী কেবল চরিত্র-গুণে দেশের সর্ব্বপ্রধান অভিজাত পরিবারের কুলবধূদিগের নিকট এইপ্রকার সমাদৃত হইয়াছেন, তখন রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর উপাধি ক্রয় করিবার আমার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

"দেশের যে সকল নিম্নশ্রেণীস্থ লোক এখন বড় মানুষ হইয়া কেশবলাল, কৃষ্ণলাল, মহেন্দ্রলাল, যাদবেন্দ্র ইত্যাদি বড় বড় ভদ্রোচিত নাম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর উপাধির প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ, ইঁহাদিগের পিতা পিতামহের বিষয় অনুসন্ধান করি-লেই, দধিরাম কিংবা বাঞ্ছারাম ইত্যাদি এইপ্রকার একটা নাম বাহির হইয়া পড়ে।

"এই সকল বাঞ্ছারাম এবং দধিরামের পুত্র পৌত্রগণ ভদ্রোচিত নাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, কিংবা রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন বলিয়া, আমি তাঁহাদিগকে কখনও হিংসা করি না। নিম্নশ্রেণীস্থ লোক যতই ভদ্র হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আমার প্রজা মাধব দাসের পুত্র জগা এবং রূপাকে আমি এখন আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদ প্রদান করিয়াছি। তাহাদিগকে আমি ভদ্রশ্রেণীভুক্ত করিব। কারণ, তাহারাই কেবল আমার পিতার বিপদের ভাগী হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কিন্তু জগা এবং রূপা যে রাস্তা দিয়া ভদ্রসমাজে আসিয়া প্রবেশ করিল, রায় বাহাদুর উপাধিধারী দধিরাম এবং বাঞ্ছারামের বংশাবলী সেই পথ দিয়া সমাজে উঠিলেই তাহাদের বিশেষ গৌরব হইত। চরিত্রগুণে লোক সমাদৃত হইলেই দেশের মঙ্গল হয়। আমাদের দেশে লোকের টাকা হইলে তাহারা রায় হয়। কিন্তু মনুষ্যত্ব না থাকিলেই মানুষ বাঁদর বলিয়া পরিচিত হয়। সুতরাং মনুষ্যত্ববিহীন ধনীর সন্তান রায় বাহাদুর হইলেই তাহাকে রায় বাঁদর বলিয়া লোকে মনে করে। তখন রায় বাহাদুর আর রায় বাঁদর এক কথা হইয়া পড়ে।

"আমার পত্র বড় সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। অতএব অন্যান্য বিষয় পঞ্জাবে পৌছিয়া লিখিব। মনে করিও না যে, বঙ্গদেশের নিমিত্ত আমার ভালবাসা নাই। দুই তিন বৎসর পর এক এক বার বঙ্গদেশে আসিব।

"আমার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা তোমার নিকট লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। দুই বৎসর হইল আমার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। কমলাদেবীর পুত্র ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমার স্ত্রীর সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এখন আমাদের বাড়ীতে আছেন। রামসিংহ এবং লক্ষ্মণসিংহও সপরিবারে আমাদের সঙ্গে একত্রে আমার বাড়ীতেই আছেন।

"ক্ষেত্রনাথের বঙ্গদেশের লোকের উপর বড় ঘৃণা। তিনি বঙ্গদেশকে নরক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার প্রতিবেশিগণ যে তাঁহার জননীর সম্বন্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ ঘৃণার উদয় হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশে বিবাহ করিতেও প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন। পরে আমি, কমলাদেবী এবং লক্ষ্মণসিংহ অনেক বুঝাইলে, আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন।

"রামসিংহের স্ত্রীকে আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়েই মা বলিয়া ডাকি। তিনিও আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। রামসিংহ এখনও আমার স্ত্রীকে নান্‌কু বলিয়া ডাকেন। আমার স্ত্রী প্রত্যেক দিনই স্বহস্তে রামসিংহকে সিদ্ধি ঘুটিয়া দেন। তিনি সিদ্ধি ঘুটিয়া না দিলে, রামসিংহের মনোমত সিদ্ধি প্রস্তুত হয় না।

"আমি কখনও কখনও আমার স্ত্রীকে রামকৃষ্ণ অধিকারী বলিয়া ডাকি। তখন তিনিও আমাকে সম্বন্ধী বলিয়া সম্বোধন করেন।

"প্রত্যহ অপরাহ্ণে আমি, আমার স্ত্রী, রামসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ, তাঁহাদের পরিবার, কমলাদেবী, ক্ষেত্রনাথ এবং তাঁহার স্ত্রী—আমরা সকলেই একত্র হইয়া আমাদের খিড়কীর পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া বসি। তখন আমাদের বড়ই আনন্দ বোধ হয়। এখানে বসিয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে রামসিংহ এক গ্লাস সিদ্ধি পান করেন। তাঁহার সিদ্ধি পান করিবার আধ ঘণ্টা পরেই তাঁহার মুখ খোলে। তখন তিনি দেবীসিংহকে এবং দেবীসিংহের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিসী, মাসী, সমুদয় আত্মীয় স্বজনের নাম ধরিয়া গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। প্রত্যহই একপ্রকার ভূমিকা করিয়া গালিবর্ষণ করিতে

আরম্ভ করেন। "ছালা দেবীসিংহ মেরা নানকুকো বড়া তকলিফ্ দিয়া।" ছালা কুম্মাত হোছন কা বেনামে ইজারা লেকের মুল্লুক পয়মাল কিয়া।"

এই দুই বাক্য দ্বারা ভূমিকা করিয়া, দেবীসিংহের সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে রামসিংহ গালিবর্ষণ করিতে থাকেন। আমরা সকলেই তখন অবিশ্রান্ত হাসিতে থাকি।

লক্ষ্মণসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী এখনও কি প্রকারে কমলাদেবীকে সুখী করিবেন, সেই বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত আছেন। আমি সময় সময় লক্ষ্মণসিংহকে বলি।

স্পষ্টস্তং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সহৃজ্জনে !

নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণার পর আমরা এখন সুখেই আছি। যদি আমার পিতার ব্রহ্মত্র জমি খালাস করিতে পার, তবে সে জমি তুমিই ভোগ করিবে। আমার পৈতৃক বসত বাড়ীও তোমাকেই দিলাম। কিন্তু ব্রহ্মত্র জমি পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে, তাহার উপস্বত্বের কতকাংশ দ্বারা আমার পিতার অতিথিশালা পুনরায় সংস্থাপন করিবে।

লিং শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামী।

এই পত্র প্রেরণের তিন দিবস পরে, প্রেমানন্দ, রামসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ ক্ষেত্রনাথ, জগা, রূপা এবং সত্যবতীর বৃদ্ধা দাসী সকলেই আপন আপন পরিবার সহ পঞ্জাব চলিয়া গেলেন।

দেবীসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাকী জায়ের সেরেস্তার ভার প্রাপ্ত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের গবর্ণমেণ্টের সময় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ জীবনে তিনি কখনও সুখে নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইলেন না। অন্যের অনিষ্ট করিলে এ জগতে কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না।

সমাপ্ত।

APPENDIX.

KEY TO DEWA'N GANGA GOVINDA SING.

NOTE 1.

The Ray Royan was the regular channel of such communication as require the interposition of a native, and not Ganga Govind Sing, whose dismission from the Calcutta Committee had rendered him an improper person to transact affairs of such moment to the company.—*Extract from the Company's General Letter to Bengal, the 4th July.* 1777.

NOTE 2.

PARA 50. The petition of Monohur Mookerjee, stiled the dismissed farmer of Currickpore and Mongheer, pointed out to our particular notice in your Revenue letter per Syren, exhibits another instance of loss to the company, occasioned by that duplicity which has been practised by our servant during the late adminstration, in letting and holding of lands and farms in Bengal.

51. We find the circumstance, which occasioned Mookerjee's petition, was a complaint made by the Ray Royan that a balance of 13,000 Rupees was the due from him as the dismissed farmer of Currickpore and Mongheer, and that the Khalsa peons had been sent to demand the money, but were interrupted by Mr. Wordsworth. To this charge Mr. Wordsworth, who had been an assistant at Mongheer, replies, that the Ray Royan must have been mis-informed, because Dundhu Bahadur and Kerparam Ray were the two farmers dismissed from Currickpore and Mongheer, and that the facts were

too notorious to be doubted. Mookerjee also declares, on his examination, that he was Mr. Bateman's servant, and not the farmer of the district in question; that Mr. Bateman was collector, Dundhu Bahadur farmer of one Pergunnah and Kerparam of the other; and that at Mr. Bateman's request he (Mookerjee) became security for payment; that he never saw Dundhu Bahadur, that Kerparam, was one of his own people, that he believes no such man as Dundhu Bahadur exists in Bengal; and that he was security only for Mr. Bateman; that Mr. Bateman gave in proposals under the seals of Dundhu Bahadur and Kerparam, that seals were cut in the above mentioned names, and affixed to the Kabuliats by Mr. Bateman's Moonshy, who wrote the Kabuliats, and always kept the seals in his own hands; that Mr. Bateman had the possession, and enjoyed the profits of the farms, and paid him 200 Rupees per month as his Muttasudie; that Mr. Bateman told him Dundhu Bahadur and Kerparam were only nominal persons; that on asking Mr. Bateman if the two Pergunnahs were his own, he replied, that he had one share in Mongheer, and Mr. Vansittart two shares; but that he was the sole proprietor of Currickpore, that the Mehals or district having been put under the Council at Moorshedabad, Mr. Baber told the petitioner, that Mr. Bateman was not to receive the profits that year, but that they (meaning the said Council) were to receive that advantages arising therefrom, and that Mr. Baber proposed his continuing in the Mehal; and that he should give him a teep for 10,000 Rupees, which he declined, but to which he afterwards consented.

52 The orders of your Board on the occasion were, that a copy of Mookerjee's petition should be transmitted to Mr. Bateman, and so much of it to Mr. Baber as had relation to that gentleman, and that his answer thereto should be required; but, to our astonishment, we find Mr. Barwell objects to this mode of admitting on the records matter of a tendency foreign to the public business &c.—*Extract from the Court of Director's letter, dated the 30th January, 1778.*

NOTE 3.

37. A further instance, in which the conduct of the Governor-General and Mr. Barwell, as a majority of the Board, appears to us not only improper, but highly reprehensible, is that of rejecting the advice of our standing counsel, and refusing to concur in filing a bill of discovery to oblige Mr. Thackeray to declare who were the persons concerned with him in furnishing the company with elephants.

38. We observe that our late President states to the council, in consultations of the 6th September 1774, that the farmers of Sylhet had made a tender to him of about 66 elephants at 1,000 Rupees per each, that the Board esteemed it an advantageous offer, and accepted the elephants under certain conditions.

39. We find that the farm of Sylhet was granted by the Committee of Circuit, that the Company's advance to the farmers of Sylhet, of 33,000 Rupees for elephants was received by one of the members of that committee. It has however since appeared, that the ostensible farmers, or persons named in the committee's settlement, never existed ; and that Mr. Thackeray, the Company's Resident at Sylhet, was the real farmers under fictious names.—*Extract from Company's General Letter to Bengal, dated the 28th November, 1777.*

NOTE 4.

36. In our letter of the 5th February, 1777, we expressed our apprehensions that a sudden transition from one mode to another, in the investigation and collection of our revenues, might have alarmed the inhabitants, lessened the confidence in our proceedings, and been attended with others evils ; yet as we were led to hope that such information had been obtained as would enable us to ascertain, with sufficient degree of precision what revenues might be collected from the country without oppressing the natives, we felt some satisfaction in considering those evils as at an end and proceeded to give

such instructions as appeared to us necessary for your guidance in a future settlement of the lands.

37. In this state of the business our surprise and concern were great, on finding, by our Governor-General's minute of 1st November, 1776, that, after more than seven years' investigation, information is still so incomplete, as to render another innovation, still more extraordinary than any of the former, absolutely necessary, in order to the formation of a new settlement,—*Extract from Company's General Letter to Bengal, 4th July, 1777.*

— —

NOTE 5.

"In the late proceedings of the Revenue Board ?" observes the majority of the Counsil "there is no species of peculation from which the Hon'ble Governor-General has thought it right to abstain."—*Biveridge's History of India, page 383.*

NOTE 6.

45. We observe that our Attorney was served with notice of trial the 14th November, about twenty days after death of Colonel Monson, and to our cost we find, that the majority of the Council consisting then of the Governor-General and Mr. Barwell, instead of preparing for a proper defence, deserted the cause, and thereby subjected the company to the payment of the money (claimed by Thackeray. * *

48. Upon the whole of this transaction, as we fully approve the conduct of General Clavering and Mr. Francis, because it has been, in our opinion, highly meritorious, so we are compelled to declare, that the behaviour of our Governor-General and Mr. Barwell has, in this instance, been highly improper, and inconsistent with their duty,—*Extract from the Company's General letter to Bengal, dated the 28th November, 1777.*

NOTE 7.

131. From a view of your conduct towards the Ranny of Burdwan, and the Ranny of Rajshahye, and her adopted son Rajah Ramkissen, and from your interesting debates concerning those persons, we have already been induced in the 92nd paragraph of our letter of the 4th March, to express our disapprobation of every mode of vexatious interference in the private concerns of the zemindars, and of the idea of disturbing them in the quiet enjoyment of their possessions; and as the Rannies above-mentioned appeared to have suffered an unusual degree of inconvenience and distress since, by the death of Colonel Monson the Governor-General and Mr. Barwell became a majority of the Board, we now direct, as the most eligible mode of doing justice to all parties, that soon as conveniently may be after the number of our Council shall be complete, and consist of Five Members, the whole of the proceedings of our Council relative to the Ranny of Burdwan and to the Ranny of Rajshahye, be taken into your most serious consideration, and that to the utmost of your power the most impartial justice be rendered to the zemindars above-mentioned; and if it shall appear to the Three Members of the Board, that the requisitions and injunctions of the Governor-General and Mr. Barwell, respecting the Ranny of Burdwan, were improper, and the re-establishment of Bridjokishore Ray who had been removed by the late majority, and the placing of a military force upon the Rajah's house; were acts of oppression, or that the dispossession of Ranny of Rajshahye and her adopted son, and the distinction in her disfavor, respecting out-stading balances were unwarrantable proceedings; we direct that you make such reparation to those zemindars as their respective cases shall require.— *Extract from Company's Genaral Letter, dated the 23rd December, 1778.*

"The Ranny of Burdwan" says Mr. Richard Barwell the most dishonest and unscrupulous member of the Council "is

a vile prostitute."—*Extract from Barwell's letter to Mrs. Mary Barwell.*

NOTE 8.

But to pursue this melancholly but necessary detail, I am next to open to your Lordships, what I am hereafter to prove, that the most substantial and leading yeomen, the responsible farmers, the parochial Magistrates and chiefs of villages were tied two and two by legs together; and their tormentors, throwing them with their heads downwards over a bar, beat them on the soles of the feet with ratans, until the nails fell from the toes; and then attacking them at their heads, as they hung downwards, as before at their feet, they beat them with sticks and other instruments of blind fury; until the blood gushed out at their eyes, mouths and noses.

Not thinking that the ordinary whips and cudgels, even so administered, were sufficient, to others (and often also to the same who had suffered as I have stated) they applied instead of ratan and bamboo, whips made of the branches of Bale trees (বেলগাছ)—a tree full of sharp and strong thorns, which tear the skin and lacerate the flesh far worse than ordinary scourages.—*Edmund Burke, page 188.*

NOTE 9.

Your deliberations on the inland trade have laid open to us a scene of the most cruel oppression, which is indeed exhibited at one view of the 13th article of the Nabab's complaints mentioned thus in your consultation of the 17th October, 1764. • • • • We shall, for the present, observe to you, that every one of our servants concerned in this trade, has been guilty of a breach of this covenants and a disobedience to our orders. In your consultations of the 3rd May, we find among the various extortionate practices, that most extraordinary one of "*Barjaut*" or forcing the natives to buy goods beyond the market price, which you there acknowledge to have been frequently practised

In your resolution to prevent this practice, you determine to forbid it, but with such care and discretion, as not to affect company's investment, as you do not mean to invalidate the right derived to the company from the Firman which they have always held over their weavers. As the company are known to purchase their investment by ready money only, we require a full explanation how this can affect them or how it could ever have been practised in the purchase of their investment, which the latter part of Mr. Johnstone's minute entered in consultation the 21st July, 1764, insinuates; for it would almost justify a suspicion, that the goods of our servants have been put off to the weavers in part payment of company's investment: therefore we direct you to make a rigid scrutiny into the affairs, that we may know that any of our servants or those employed under them, have been guilty of such breach of trust, that their names and all the circumstances may be known to us,—*Extract of a letter from the Court of Directors to the President and Counsil at Fort William in Bengal, dated the 28th December, 1765.*

NOTE 10.

The following is the translation of the letter addressed to Sheer Ally Khan, Phowsdar of Purniah by Messrs. Johnstone, Hay and Bolts recorded at Fort William consultation, dated the 17th December, *1762*.

Our Gumastah Ramcharan Das, being gone into those parts, meets with obstructions from you, in whatever business he undertakes, moreover you have published a prohibition to this effect, that whoever shall have any dealing with the English you shall seize his house and lay a fine upon him. In this manner you hav prohibited the people under your jurisdiction. We were surprized at hearing of this affair, because that the Royal Firman which the English nation is possessed of, is violated by this proceedings; but the English will by no means suffer with patience their Firman to be broke through. We therefore expect that, upon the receipt of this letter you will take

off the order you have given to the Ryots, and in case of your not doing it, we will certainly write to the Nobab, in the name of the English, and send for such an order from him, that you shall restore fully and entirely whatever loss the English have sustained or shall sustain, by this obstruction; and that you shall repent having thus interrupted our business, in despite of the Royal Firman. After reading this letter, we are persuaded, you will desist from interrupting it, will act agreeably to the rules of friendship, and so that your amity may appear, and by no means stop the company's Dustuck.

NOTE 11.

. . . Upon Ramnauts's going out of the Governor's Chamber, and coming into the Hall, he was suddenly met by a party of Sepoys with fixed bayonets, commanded two black officers named Sontose and Dil Mohomed, who in that instant seized him; and not permitting him to ride in palanqueen, marched him on foot through the town, from the Governor's to his own house, where they kept him in strict confinement, with guards upon his doors, and even in his innermost appartment, not permitting any person but his own menial servants to have access to him . . . He remained in that situation until Sunday the 3rd May, 1667; in the evening of which day he sent to inform the writer (Mr. Bolts) he had just received private intelligence that order had been received from Governor Verelst, then with the Nobab at Murshedabad to Mr. Cartier then at Calcutta to deliver him (Ramnaut) up to the Nobab for confinement. . . . .

By letter afterwards received from him (Ramnaut) it appeared, that he was actually transferred to the Nobab at Murshedabad for confinement, during which time his family at Maldah was put to the greatest hardship and distress.—*Bolts on India affairs, pages 101, 102 and 103.*

NOTE 12.

Accordingly in plain terms, he (Devi Singh) opened

a local brothel, out of which he carefully reserved very flower of his collection for the entertainment of his young superiors ; ladies recommended not only by personal merit, but according to the Eastern custom, by sweet and enticing names which he had given them. For, if they were to be translated, they would sound,—Riches of my life,—Wealth of my soul,—Treasure of perfection,—Diamond of Splendour,—Pearl of Price,—Ruby of pure blood and other metaphorical descriptions, that, calling up dissonant passions to enhance the value of the general harmony, heightened the attractions of love with the allurements of avarice. A moving Seraglio of these ladies always attended his progress, and were always brought to the splendid and multiplied entertainments whith which he regaled his Counsil.—*E. Burke, pages 177-78.*

NOTE 13.

Even in these days, instances are not wanting, which will show that when the estate of any minor zemindar, or any minor independent native chief, is placed under the management of any stranger or foreigner, the nearest relations of such minor experience great hardship, where as the manager's friends and relations are well provided at the expense of such estate or state.

NOTE 14.

On the same principle, and for the same ends, virgins, who had never seen the sun, were dragged from the inmost sanctuaries of their houses ; and in the open court of justice, in the very place where security was to be sought against all wrong and all violence (but where no judge or lawful Magistrate has long sat, but in their place the ruffians and hangmen of Warren Hastings occupied the bench) these virgins, vainly invoking heaven and earth in the presence of their parents, and whilst their shrieks were mingled with the indignant cries and groans of all the people, publicly were violated by the

lowest and wickedest of the human race. Wives were torn from the arms of their husbands and suffered the same flagitious wrongs, which were indeed hid in the bottoms of the dungeons in which their honor and their liberty were buried together. Often they were taken out of the refuge of this consoling gloom, stripped naked, and thus exposed to the world, and then cruelly scourged ; and in order that cruelty might riot in all the circumstances that melt into tenderness the fiercest natures, the nipples of their breasts were put between the sharp and elastic sides of cleft bamboos. Here, in my hand, is my authority ; for otherwise one would think it incredible. *Edmund Burke's speech, page 189-90.*

Children were scourged almost to death in the presence of their parents. This was not enough. The son and father were bound close together, face to face, and body to body, and in that situation cruelly lashed together, so that the blow which escaped the father fell upon the son, and the blow which missed the son wound over the back of the parent.—*Ibid.*

NOTE 15.

The peasants were left little else than their families and their bodies. The families were disposed of. It is a known observation, that those who have the fewest of all other worldly enjoyments are the most tenderly attached to their children and wives. The most tender parents sold their children at market. The most fondly jealous of husbands sold their wives. The tyranny of Mr. Hastings extinguished every sentiments of father, son, brother and husbands !

I come now to the last stage of their miseries : everything visible and vendible was seized and sold. Nothing but the bodies remained.—*Edmund Burke's speech, page 186,*

NOTE 16.

The variety and frequent changes of those employed in the collections may be included in the causes of this discontent.

In 1188 Kishen Prosad was appointed Dewan and collector of Rungpur by Rajah Devi Singh. In Bhadoon he was turned out and Hur Ram was appointed in his stead and continued to the end of that year. In 1189 after three months Hur Ram refused to take upon him the responsibility for revenues of the District, and in Assar he was succeeded by Surjanarain. In Aughan the Rajah's brother Bekadre Singh (the name in unintelligible in the original papers found by the author in the Board of Revenue) arrived and was invested with the management of the collections in which he exercised every kind of severity and rigour. Surjanarain continued to act as Dewan. The zemindars of Kakina and Tepah fled from the country and both their zemindaries were given in farm to Surjanarain. —*Extract from Paterson's Report, May 1783.*

NOTE 17.

His (Ganga Govinda's) conduct then was licentious and unwarrantable, oppressive and extortionary. He was stationed under us to be an humble and submissive servant. His conduct was everything the reverse.

In one attempt to release fifteen persons illegally confined by him, we were dismissed our offices ; a different pretence was held out for our dismission, but it was only a pretence.—*Evidence in the trial of Hastings.*

NOTE 18.

—It was then I was under the necessity of sending Lieutenant Macdonald the order No. 5. The assuming a power that affects life and death is never to be justified, but on the greatest emergencies. My situation, as I observed to you before, was the most critical that ever a Collector was placed in ; the state of the couutry required the most active and vigorous exertions in order to quiet it. I had no time to wait for orders from my superiors ; and had I ever given the insurgents an idea that I was deficient in authority to punish them, I never

could have got better of the insurrection.—*Extract from Mr. Richard Goodlad's Report, dated Rungpur, March, 1783.*

Mr. E. G. Glazier in his report on the District of Rungpur observes :—"Whatever Devi Singh's enormities may have been, nothing is clearer from the whole history of the transactions than that Mr. Goodlad knew nothing of them."

I think Mr. Glazier is sadly mistaken in thinking that there was nothing to show that Mr. Goodlad know anything about the oppressien exercised by Devi Singh. It is quite evident from Mr. Paterson's report that both Devi Singh as well as Mr. Goodlad tried to suppress evidence during the enquiry held by him.

Mr. Paterson observes :—"Upon my first arrival the Ryots of Futtehpur complained against the article of Batta and Dureevilia. I referred them to Mr. Goodlad as I had none of my people with me ; and he referred them back to the Rajah (Devi Singh) who immediately put the zemindar Seeb Chandra Choudry in irons, charging him with exciting the Ryots to complain to the Ameens. This was my reason when I requested your orders what measure I should take if any one was punished for complaining to me."

Elsewhere he (M. Paterson) observes "I had entrusted these accounts to Mr. Goodlad who promised to return them after taking copies. But Mr. Goodlad went away without returning them, and I now find they are with the Rajah (Devi Singh) in Calcutta,

[Rajah filed] "different accounts at various times differing very materially in the *Jama* and *Wassil* with an idea I presume to perplex me to delay my reports."

These facts clearly prove that Mr. Goodlad also tried to suppress evidence during the enquiry.

Mr. Glazier for reasons best known to himself in page 71 (Appendix A) of his Report on Rungpur says "that enclosures 1. 3, 4, 5, 7, and 9 omitted." These enclosures were the successive orders (*Hookum namah*) issued by Mr. Goodlad during the insurrection. And the order or *Hookum*

Jamah No 5 would speak very much against Mr. Goodlad as he himself admitted it.

NOTE 19.

A party of Sepoys, under Lieutenant Macdonald, marched to the north against the principal body of insurgents; a spy caught by the Lieutenant was hung in open market, and a Jemadar was despatched against the retreating enemy. The decisive battle of the campaign was fought near Patgram on the 22nd February: the Sepoys disguised themselves as Burkundazes by wearing white cloth over their uniform, and by that means got close to the insurgents, who were utterly defeated: sixty were left dead on the field, and many were wounded, and taken prisoners.—*Glazier's Report on Rungpur, page 22.*

NOTE 20.

It was recommended to me in my instruction to call upon the prisoners taken in the insurrection to account for their conduct, and in case they complained of oppression, to enquire into the truth of it by an examination of both parties.

Mr. Goodlad accordingly delivered over to me 22 prisoners. As I understand that many had been taken, I naturally concluded that there would appear against these men some circumstances of guilt, particularly glaring which had occasioned their being singled out from the rest. But to my surprise, I found upon examination, that they were neither ring-leaders nor taken in any act or situation that could be construed against them, They were for the most part coolies, the lowest of mankind, taken many of them out of their own houses or at plough, this appears from the declaration of Telukchand who apprehended some of them and of Shaik Mahomed Mollah who likewise took several.

The Burkundazes and horsemen who were detached in parties to desperse the insurgents, made an universal plunder and trade of the people that fall into their hands. Those who

could pay were set free ; those who had it not, were detained as proof of their deligence. Upon my expreessing my surprise to Shaik Mahomed Mollah that he should seize people against whom he could bring no charge of guilt ; he explained himself in this manner,

That the insurgents assembled in many parts and went from place to place leaving contributions and obliging the Ryots to join them. That upon information of their appearing in any village, he detached a party against them, that upon approach of such party the insurgents always fled, and that his people seized inhabitants of the place when the insurgents had disappeared, that he was not to judge of their innocence or delinquency, that in general confusion like this no distinction could be made at the time -- *Extract from Mr. Paterson's Report (A) dated Rungpur 18th May, 1783.*

NOTE 21.

Two commissions sat on this insurrection, and in February, 1789, in the time of Lord Cornwallis, the final order of Government were passed. Devi Singh got off scot-free, with the exception of the loss of his money. Hur Ram, a native of Rungpur, who had been the sub farmer under him, and whose oppression had brought about the rising, was sentenced to one year's imprisonment, after that time to be banished from the District of Rungpore and Dinagepore. Five Ryots, the ringleaders (they were not ring-leaders, but Mr. Glazier says so) of the insurgents, were also banished ; two of them, men of Dimla, had apparently been in confirement since the time of the insurrection.—*Glazier's Report on the District of Rungpur, page 22.*